ছ-খানা ছবি

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ

নারায়ণ ফার্ম্মেসী
৯৯নং আপার সারকুলার রোড কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ॥৹ আনা।

প্রকাশক
ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্র, এল্, এম্, এস্,
নারায়ণ ফার্ম্মেসী, ৯৯নং আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

নিউ আর্টিষ্টিক্ প্রেস
১এ, রামকিশন দাসের লেন, কলিকাতা।
শ্রীশরৎশশী রায় দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন।

অধুনালুপ্ত দুইখানি (প্রকৃতি এবং মহিলা) মাসিক পত্রিকায় এই গল্পগুলি বাহির হইয়াছিল—সেগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া পুস্তকাকারে এখন বাহির করিলাম।

স্নেহের জয় গল্পটি ইংরাজি গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত। ইতি।

৮৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা,
৩০এ আগষ্ট, ১৯১৯। } গ্রন্থকার।

সূচী

ছ-খানা ছবি

প্রত্যর্পণ

যখন পাটের কাজে লোকসান দিয়া হরেন্দ্রনাথ বসু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার স্ত্রী সুরমা তাঁহাকে কত বুঝাইলেন—"তুমি পুরুষ মানুষ, অমন দমে পড়লে চল্‌বে কেন? এবারে লোকসান হয়েছে, আস্‌ছেবারে আরও একটু বুঝে সুঝে কাজ কর তাহলেই হবে। সব কাজেইত লাভ লোকসান আছে, অত ভাব্‌লে চল্‌বে কেন—মাঝ হ'তে শরীরটা মাটি হয়ে যাবে। এত আর মানুষের জীবন নয় যে গেলে আর হবে না।"

স্ত্রীর কথা ফলিল—তাহার পরের বৎসরে সমস্ত লোকসান উসুল হইয়া পাটের কাজে যথেষ্ট লাভ হইল।

হরেন্দ্রনাথ সবেমাত্র ৭।৮ বৎসর এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন—আরম্ভ হইতেই বেশ কাজ করিতেছেন।

হরেন্দ্রনাথ যখন কলেজে পড়িতেন তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার আঠারো বৎসর বয়স, সবেমাত্র বিবাহ

হইয়াছে। পত্নী সুরমা তাঁহাপেক্ষা ছয় বৎসরের ছোট। আর একটী ছোট ভাই, তখন তার বয়স ১০ বৎসর। সংসারে আর কেহ ছিল না, পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই জননী সংসারের নিকট বিদায় লইয়াছিলেন।

পিতৃবিয়োগের পর হরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন যে তাঁহার লেখাপড়া করা আর চলিবে না—কেননা অনাহারের হাত হইতে ভাই ও স্ত্রীকে রক্ষা করিতে হইবে ত?

অতি কষ্টে অনেকের খোসামোদ করার পর কলিকাতায় কোনও সওদাগরী আফিসে তাঁহার একটা কাজ জুটিল। স্ত্রী ও ভাই দেশে রহিলেন। হরিহরপুর তাঁহার দেশ, হরিহরপুর গণ্ডগ্রাম; অনেক ভদ্রলোকের বাস। তিনি নিজে কলিকাতায় এক মেসে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন—শনিবার দিন দেশে যান ও সোমবার দিন সকালে ফিরিয়া আসেন। আট বৎসর চাকরী করার পর কাজে ইস্তফা দিয়া তিনি পাটের দালালি আরম্ভ করেন।

দেখিতে দেখিতে পিতৃবিয়োগের ১৬ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে তাঁহার সংসারে লক্ষ্মীশ্রী দেখা দিতেছে। তাঁহার ছোট ভাই যতীন্দ্রনাথ এখন কমিসেরিয়টে চাকরী করে, তিনিই যোগাড় করিয়া এ চাকরী জুটাইয়াছেন। নিজের বুদ্ধিবলে এবং খোসামোদের জোরে সে বেশ উন্নতি করিতেছে। মিরাট তাহার কর্ম্মক্ষেত্র, সে সেখানে এবার হইতে সপরিবারে বাস করিবে। তাহার স্ত্রী শৈলবালা দেখিতে মন্দ নহে! সবেমাত্র বিবাহের পর বৎসরাধিক কাল হইল, সে স্বামীর ঘর করিতেছে। সেখানেও আবার তাহার থাকা হইল না, সুদূর পশ্চিমে এই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কিশোরীর পক্ষে যাওয়া সত্যই কষ্টকর। স্বামীত

সমস্ত দিন আফিসের কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিবেন, আর সে বেচারা কি করিবে? নিঃসঙ্গ একাকী সুদূর প্রবাসে সে কেমন করিয়া দীর্ঘ দিনগুলি কাটাইবে? যখনই এ কথাটা ভাবে, তখনই সে যেন কেমন মুসড়িয়া পড়ে। তাহাদের এখনও কোন সন্তানাদি হয় নাই। হরেন্দ্রনাথের এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম ধীরেন্দ্রনাথ বয়স ৮ বৎসর, কন্যা রমা তাহার চেয়ে ৪ বৎসরের ছোট।

সুখ সকলের ভাগ্যে সহে না—সুরমার ভাগ্যেও এত সুখ সহিল না। ৩৬ বৎসর বয়সে বৈশাখ মাসে হরেন্দ্রের খুব কঠিন পীড়া হয়, মাসাধিক কাল রোগযন্ত্রণা ভুগিয়া সকল জ্বালার হাত হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিলেন! সুরমার কপাল ভাঙ্গিল! দাদার পীড়ার সংবাদ যতীন্দ্রনাথ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, সুতরাং সপরিবারে মিরাট হইতে তিনিও চলিয়া আসিয়াছিলেন।

শ্রাদ্ধাদি চুকিয়া গেল। শোকের প্রথম বেগ কতকটা কমিয়া আসিল। যতীন্দ্রনাথ পরের চাকর তাঁহাকেও আবার শীঘ্র কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যাইতে হইবে—যাত্রার পূর্ব্বে বিষয়ের একটা বিলিব্যবস্থা করিতে হইবেত? তিনি না দেখিলে এই অনাথ পরিবারকে এখন আর কেইবা দেখে?

ইহার মধ্যে একদিন কথাপ্রসঙ্গে যতীন্দ্রনাথ বলিলেন—"বৌদি, দাদাত যথেষ্ট উপার্জ্জন করেছেন, কিন্তু দেখ্ছি যে তিনিত কিছুই রেখে যেতে পারেননি, মোটেই বুঝে চলেননি, দুহাতে খরচ করে গেছেন, দেনাও ত যথেষ্ট রয়েছে, সব হিসেব মিটিয়ে বড় বেশী কিছু থাক্‌বে তা মনে হয় না।" বিস্মিতা সুরমা কহিলেন—ঠাকুরপো কি বল্‌ছ!" যতীন্দ্রনাথ বলিলেন "হাঁ

বৌদি, ঠিকই বল্‌ছি, বড় মুস্কিল দেখ্‌ছি।" সুরমা আর কোনও উত্তর দিলেন না। সব ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন—বুঝিলেন যে স্ত্রীর পরামর্শে আজ তাঁহার উপযুক্ত দেবর বিষয় সম্পত্তির গুরুভার তাঁহার স্কন্ধ হইতে হাল্কা করিয়া লইয়া নিজের ঘাড়ের বোঝাটাকে গুরুতর করিয়া তুলিতে সচেষ্ট! নিরাশ্রয়া অসহায়া বিধবার উপর এতদূর অবিচার! দেবরের এই নির্ম্মম ব্যবহার তাঁহার মর্ম্মে গিয়া আঘাত করিল! অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা অপেক্ষা অকৃতজ্ঞ দেবরের আচরণ তাঁহাকে অধিকতর পীড়া দিতে লাগিল। পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহধর্ম্মিণীর প্রতি একি নিষ্ঠুর ছলনা! তিনি নিজের জন্য কোনদিনই ভাবেন না, তবে তাঁর দুধের ছেলে মেয়ে দুটোর কি হইবে?

আজ প্রায় ২০ বৎসর হইল তিনি এই পরিবারে আসিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথ তখন বালক ছিল। এই বিশ বৎসরের সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদের সমস্ত অংশ তিনি সকলের সঙ্গে সমান ভাবে বহন করিয়া আসিয়াছেন—জীবনে যে জিনিষটা কোনদিনই ভাবেন নাই, আজ সেই জিনিষটা প্রবল হইয়া মাথাখাড়া করিয়া কদর্য্যভাবে তাঁহার গতিরোধ করিতে চাহিতেছে! দাদার ছায়ায় যে বাড়িয়াছে, দাদার অন্নে যে পুষ্ট, এবং এমন কি আজ সুদূর মিরাটে সে যে স্বচ্ছলভাবে সংসার চালাইতেছে সেটাও দাদার চেষ্টার ফলে—যিনি সেবার দ্বারা, স্নেহের দ্বারা এবং ত্যাগের দ্বারা প্রাণপণ করিয়া এই পিতৃহীন ছোট ভাইটিকে পিতৃনির্ব্বিশেষে পালন করিয়া আসিয়াছেন আজ কিনা তাঁহার অবর্ত্তমানে বাস্তবিকই সে এমনি অকৃতজ্ঞ হইবে, যে তাঁহার শোকাতুরা বিধবা ও অসহায় শিশুদ্বয়কে তাহাদের যথার্থ অধিকার হইতে এইরূপভাবে বঞ্চিত করিবে!

সুরমা বেশ জানিতেন যে তিনি যদি একটু বাঁকিয়া দাঁড়ান তাহা হইলে যতীন্দ্রনাথ চট্ করিয়া কোনমতেই পারিবে না। তবু যখন সে ফাঁকি দিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তাঁহার পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য—আপনাদের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য তবে কি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ? না, তাহা তিনি পারিবেন না। তিনি মনে মনে জানিতেন, যে ভগবানের রাজত্বে কেহ কাহাকেও ফাঁকি দিতে পারে না, যাহার যে-টুকু প্রাপ্য সংসার তাহাকে সেটুকু দিবেই দিবে। যেটাকে আজ ক্ষতি মনে হইতেছে, যেটার অভাব আজ পীড়ন করিতেছে, সেই অভাব এবং ক্ষতির মধ্য দিয়া এমন একটা অজ্ঞাতশক্তি নিজেকে উন্মুখ করিয়া আছে, এমন একটা চেষ্টা নিজেকে জাগ্রত রাখিতে চাহে, এমন এমন একটা অ-দৃষ্ট-সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে, যেটাকে ঠিক মাপ-কাটি দিয়া কোনদিনই ওজন করা যায় না! সুরমা আরও ভাবিলেন আমি কষ্ট পাই দুঃখ নাই কিন্তু এই নিরপরাধ শিশু দুটাত কোন অপরাধ করে নাই, তবে তাহারা দুঃখ পাইবে কেন? অভাব অথবা দারিদ্র্যের কবল হইতে তাহাদের রক্ষা করিতে হইলে মামলা করা ভিন্ন উপায় নাই, দুঃখ কিম্বা কষ্ট যতই ভীষণ হউক না কেন, যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তবু নালিশ করিতে তিনি সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। সমস্ত পৃথিবীর ভার যিনি বহন করিতেছেন, তিনি কি তাঁহার কোনও উপায় করিবেন না? সুরমা মানবের অনুগ্রহ কিম্বা বিচারের হাত হইতে নিজের চিন্তাকে মুক্ত করিয়া, অসহায় অবস্থায় ভগবানের উপর নির্ভর করিতে শিখিলেন। পার্থিব ক্ষতি তাঁহাকে বিপুল লাভের পথ দেখাইয়া দিল।

সত্যই যখন স্বামীর ভিটা ছাড়িয়া নাবালক পুত্র কন্যাকে লইয়া

সুরমাকে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল, তখন তাঁর বুক ফাটিয়া গেল—কিছুতেই চোখের জল বাধা মানিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। বিধবার অসহ্য যন্ত্রণা এই গৃহেইত রজনীর নিদ্রার মধ্যে শান্তিলাভ করে। অবিচ্ছেদ্য সুখ দুঃখের স্মৃতি উহার সঙ্গেই না জড়িত? এ যে তাঁর স্বামীর গৃহ, পুণ্যভূমি—তীর্থক্ষেত্র। হায়, হতভাগিনি, আজ তোমার দেবরের চক্রান্তে স্মৃতিঘেরা সেই গৃহ হইতে বিতাড়িত হইলে!

দেবর ও তাঁহার পত্নীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সুরমা পুত্র কন্যা সহ স্বামীর গৃহ হইতে বিদায় লইলেন। হাত তুলিয়া তাঁহার দেবর যাহা দিয়াছিলেন, তাহাতে অন্যত্র একটী ছোট বাটী ক্রয় হইল বটে, কিন্তু ইহাতেই যে তাঁহার হাত এক রকম খালি হইয়া গেল। নিরুপায়ের উপায় ভগবান। এই ভরসায় তিনি অকূলে ভাসিলেন।

স্বচ্ছল অবস্থা হইতে হঠাৎ অস্বচ্ছল অবস্থায় পড়িয়া, সুরমা একটু বিব্রত হইলেন। অবুঝ ছেলে মেয়ে দুইটিত কিছুই বুঝে না যে তাহাদের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে—বিশেষতঃ মেয়ে প্রায়ই বায়না ধরে এবং বলে "চল না মা আমাদের বাড়ী যাই।" সে ত বুঝে না যে তাহাদের পৈত্রিক ভিটায় প্রবেশ করিবার অধিকার হইতে আজ তাহারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত!

*   *   *   *

যতীন্দ্রনাথ মিরাটে চলিয়া গিয়াছেন। প্রথম গিয়া সুরমাকে দুই একবার চিঠি দিয়াছিলেন—ক্রমে চিঠি লেখা বন্ধ হইল।

দিন যায়, সময় কাহারও মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে না। তুমি সুখে হাসিতেছ না দুঃখে কাঁদিতেছ, সময় সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। দুঃখে সুরমার দিন কাটিতে লাগিল। প্রতিবেশীরা সকলেই

সুরমাকে ভালবাসে, নানা ভাবে অনেকেই তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। সুরমা সকলের মঙ্গলের চেষ্টা করেন, সেই জন্য তাঁহার উপর সকলের একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধাও আছে।

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিল। আনন্দময়ীর আগমনে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। প্রবাসে যিনি একা পড়িয়া আছেন, তাঁহার মনে এখন কত আশা, কত উৎসাহ! আবার বহুদিন পরে দেশে ফিরিয়া যাইবেন, চিরপরিচিত প্রিয়-জনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইবে। পূজাই না বাঙ্গালার সম্মিলনীর মহোৎসব! তাই জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া বাঙ্গালী বৎসরে একবার আনন্দে মাতিয়া উঠে।

হরিহরপুরের জমীদার বাড়ীতে পূজাতে বরাবরই খুব ধূমধাম হইয়া থাকে। জমীদার হরিমোহন চৌধুরী বেশ সদাশয় ব্যক্তি, সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করে। তাঁহার বয়স বেশী নহে—ত্রিশের অধিক হইবে না।

জমীদার বাড়ীতে লোকের খুব ভিড় হইয়াছে—দলে দলে লোক প্রতিমা দেখিতে আসিতেছে। রমা ও ধীরেন পাড়ার লোকের সঙ্গে আসিয়া প্রতিমা দেখিয়া গিয়াছে। আনন্দের দিনে সকলেই নিজের সাধ্যমত ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নূতন পোষাক পরিচ্ছদে সাজাইয়াছেন। নানা রংয়ের কাপড় চোপড় পরা ছেলে মেয়ের দলকে নানা রংয়ের ফুলের মত দেখাইতেছে। বাড়ী ফিরিয়া রমা তাহার জননীকে বলিল—"মা, আমায় নতুন কাপড় পরিয়ে দাও।" এই কথাগুলি শুনিয়া তাহার দাদা বলিয়া উঠিল—"আমাদের বাবা নেই যে, মা কোথায় কাপড় পাবেন?" বালিকা বলিয়া উঠিল "হাঁ মা, বাবা না থাক্‌লে নতুন কাপড় পরে না?"

সুরমার আহত মাতৃহৃদয়ে কথাগুলা তীরের মতন বিঁধিল। অত্যন্ত স্নেহের এই অবোধ ছেলে মেয়ে দুটীকে এবারত তিনি অতি সামান্য নূতন বস্ত্রও জোগাইতে পারেন নাই। কত কথাই না তাঁর মনে পড়িল —চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া গেল! তিনি ভাবিলেন গত বৎসর এই দিনে কে মনে করিয়াছিল যে তাঁর কপাল ভাঙ্গিবে, কে ভাবিয়াছিল যে এরূপ নিরাশ্রয় ভাবে তাঁহাকে ভাসিতে হইবে, কে জানিত যে, তাঁহার সুখের নীড় এরূপ ভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে? একটী বজ্রা-ঘাতে সমস্ত চূর্ণ হইয়া গেল। একজনের সঙ্গে সব শেষ হইয়া গিয়াছে, কাঁদিবার জন্য পড়িয়া রহিলেন শুধু—তিনি! এই পূজার সময়েইত তিনি ছেলে মেয়েকে বরাবর মনের মতন সাজাইয়া আসিয়াছেন, আর আজ কি না সামান্য একখণ্ড বস্ত্রও দিতে পারেন নাই। আনন্দময়ীর আগমনে ত ঘরে ঘরে আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে, হায়, হতভাগিনি, তোমার ভাঙ্গা ঘরে ভরাট অন্ধকার কি আজও জমাট বাঁধিয়া থাকিবে! মাতৃহৃদয়ের নিষ্ফল বেদনা তবে তুমিও কি বুঝ না দেবি? তবে কি মা সত্যই তুই পাষাণী—বিশ্বজননী, জননীর হৃদয়ে আঘাত দিতে তোর কি বাজে না?

আজ সপ্তমী পূজা—আজ হইতে জমীদার বাড়ীতে তিন দিন ধরিয়া যাত্রা গান হইবে। রাত্রি ৮ টার পর গাওনা সুরু হইবে। ধীরেন ও রমা উভয়েই যাত্রার কথা শুনিয়াছে। তাহারা মায়ের নিকট আব্দার ধরিয়াছে যে যাত্রা শুনিতে যাইবে। নিজের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই অবুঝ ছেলে মেয়েকে শান্ত করিবার জন্য মাতা বুঝিলেন যে, না যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই।

সূর্য্যদেব পাটে গিয়াছেন। দিবসের শেষ আলোরেখাটুকু দিগন্তের গায়ে বিলীন হইয়া গিয়াছে। মাথার উপরে মুক্ত

নীলাকাশ হাসিতেছে। নীরবে একে একে তারকা ফুটিয়া উঠিতেছে। সুরমা ছেলে মেয়ে দুটীর হাত ধরিয়া বাড়ীর বাহির হইলেন। জমীদার বাড়ীর উচ্চ মঞ্চের উপর নহবৎ বসিয়াছে। নহবৎ করুণ সুরে পূরবী রাগিণীতে আলাপ করিতেছে। সিংহদ্বার ছাড়াইয়া তিনি ছেলে মেয়েকে লইয়া একেবারে পূজার দালানের দিকে গেলেন। সে স্থানটায় তখন খুব ভিড়—কেন না সন্ধ্যা আরতি আরম্ভ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। দূর হইতেই দেবীকে ভক্তিভরে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। একটু পরেই ধূপ ধূনা জ্বলিয়া উঠিল, কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, দেবীর আরতি আরম্ভ হইল। আরতি শেষ হইবার পরে যাত্রার আসরের দিকে তিনি চলিলেন। প্রকাণ্ড সুসজ্জিত আসর, উজ্জ্বল দীপালোকে শোভিত, বিস্তর জনসমাগম হইয়াছে। ভদ্র মহিলাদের বসিবার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তিনি দেখিলেন যে জমীদার বাড়ীর বন্দোবস্ত বেশ ভালই হইয়াছে।

রাত্রি নয়টা বাজে—যাত্রা এখনও সুরু হয় নাই। তবে সুরু হইবার উদ্যোগ অয়োজন চলিতেছে। ধীরেন ও রমাকে লইয়া সুরমা মেয়েদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া বসিলেন। জমীদার-গৃহিণী সুহাসিনী সকলের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তিনি সুন্দরী। লাল টক্‌টকে বারাণসী সাড়ীখানা পরাতে আজ তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের উপর এমন একটা নিবিড় মহিমাময়ী শ্রী বেষ্টন করিয়াছে যে সহসা তাঁহাকেই দেবী বলিয়া ভ্রম হয়!

সুহাসিনী খুবই ব্যস্ত—যাহাতে কোন রকমে কাহারও প্রতি ক্রটী প্রদর্শিত না হয়, সেই দিকেই তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য। সুরমার

দিকে হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। দূর হইতেই তিনি সুরমার ও তাঁহার পুত্র কন্যার মলিন বেশ লক্ষ্য করিলেন। কি জানি কেন তাঁর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল। সুহাসিনী সুরমার পূর্ব্বাপর সকল অবস্থা জানেন, সুরমাকে তিনি দিদি বলিতেন। সুরমার বৈধব্যের পর তিনি তাঁহাকে এই দেখিলেন। ধীরে ধীরে তিনি সুরমার কাছে গিয়া ডাকিলেন—"দিদি।" সুরমা ফিরিয়া দেখিলেন—সুহাসিনী। সুহাসিনী তাড়াতাড়ি রমাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ধীরেনের হাত ধরিয়া বলিলেন—"দিদি আমার সঙ্গে এস।"

সুহাসিনী সটান সুরমা ও তাহার ছেলে মেয়েকে নিজের কক্ষে লইয়া গেলেন। বহুদিন পরে দুই বন্ধুর দেখা সাক্ষাৎ হইল—কিন্তু অবস্থার কত পরিবর্ত্তন! সুরমার আজ কাঙ্গালিনীর বেশ! উভয়েই নির্ব্বাক্, শুধু কাঁদিতেছেন। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুহাসিনী প্রথমে কথা কহিলেন, "দিদি, আজ আমি বড় ব্যস্ত দেখ্‌তেই পাচ্ছত। আজ আর বিশেষ কথাবার্ত্তা হবে না। কিন্তু মনে রেখ তোমায় হাতে পেয়ে আমি এখন আর ছাড়চিনে।" এই বলার পরে আলমারী হইতে নূতন কাপড় বাহির করিয়া রমা ও ধীরেনকে পরাইলেন—তারপরে সকলে মিলিয়া যাত্রা শুনিবার জন্য নীচে নামিয়া গেলেন!

দেখিতে দেখিতে পূজার কয়টা দিন কাটিয়া গেল। আজ একাদশী। কয়েকদিনের বিপুল কর্ম্মোৎসাহের পরে জমীদার ভবনে অবসাদের ছায়া পড়িয়াছে; বিরাটপুরী নিঝুম।

দুপুরবেলা সুহাসিনীর কামরায় সুহাসিনী ও সুরমা কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। পালঙ্কের উপরে ধীরেন ও রমা উভয়ে ঘুমাইতেছে।

সুহাসিনী বলিলেন—"হাঁ, দিদি, আমাদের কি খবর দিতে নাই ? বিষয়সম্পত্তি যখন বিলিব্যবস্থা হ'ল আমাদের কর্ত্তাকে যদি একবার খবর দিতে, তাহলে তোমার দেওর তোমাদের এতদূর ঠকাতে পারত না।"

সুরমা কহিলেন, "না বোন, এতে আবার বল্‌বার কি আছে। সে আমাকে নিজে হাতে তুলে যেটুকু দিয়েছে সেই বেশ। পাছে সে জান্‌তে পারে যে সে আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে সেটা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি এবং তাই পাছে সেজন্য সে লজ্জা পায়, তাই আমিত মোটেই তাকে বুঝ্‌তে দিই নি যে আমি তার বিদ্যে জানতে পেরেছি। তবে ছেলেটা মেয়েটার জন্য ভাবনা হয়, তা' আর কি বলব, বোন, সকলের জন্য যিনি ভাব্‌ছেন, ওদের ভারও তাঁর হাতে। আর কি জান, সবাই যে সুখের মধ্য দিয়ে মানুষ হবে এওত নয়—দুঃখের ভিতর দিয়ে মানুষ হওয়া যদি ওদের পক্ষে ব্যবস্থা হয়, সে ব্যবস্থা কি তুমি আমি চেষ্টা করে উল্টে দিতে পারি ? আর কি জান অন্যায় যা' তা চিরদিন মাথা উঁচু ক'রে থাক্‌তে পারে না, একদিন না একদিন তাকে ঘাড়মুড় গুঁজড়ে পড়্‌তে হবে। আমিই আমার দেওরকে বাধা দিতে পারতুম, কিন্তু ইচ্ছে করেই দিই নি। সে আমাকে ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মকে কি কেউ কখনও ফাঁকি দিতে পেরেছে ?" শেষের কথাগুলা সুরমা একটু উত্তেজনার বশে জোর দিয়াই বলিয়াছিলেন। সুহাসিনী মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন এবং মূঢ়ের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে তাঁহার মুখের দিকে বিস্মিতভাবে তাকাইয়া কহিলেন— "দিদি, সংসারে তুমিই দেবী।"

দুই বন্ধুতে ইহার পরে আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। শেষে সুহাসিনী বলিলেন—"আচ্ছা, আমি তোমাকে দিদি বলি ত, আমাকে ছোট বোনের কাজ করতে দাও।" সুরমা কহিলেন—"কি, বল।" সুহাসিনী ধরিয়া বসিলেন যে এই দুধের বাছারা যাতে কোনও কষ্ট না পায়, তিনি যদি তার ব্যবস্থা করিতে চাহেন, তাহাতে সুরমা বাধা দিবেন না। সুরমা উত্তরে কহিলেন, "বাস্তবিক তুমি যদি তাতে সুখী হও, আমি নিশ্চয়ই কোন বাধা দিব না।" ইহার পরে আর বেশী কথাবার্ত্তা হইল না, দুই বন্ধু শ্রান্তিভারে মেঝের উপর শুইয়া পড়িলেন।

সুরমা আরও দুই দিন থাকিয়া নিজের বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। এখন হইতে মাঝে মাঝে তিনি সুহাসিনীর ওখানে যান এবং সুহাসিনীও মাঝে মাঝে তাঁর কাছে আসেন।

দেখিতে দেখিতে বৎসর কাটিয়া গেল, সুরমা তাঁহার দেবরের বড় একটা খোঁজ খবর পান নাই এমন অবস্থায় হঠাৎ একদিন একখানা টেলিগ্রাফ আসিল যে যতীন্দ্রনাথ পীড়িত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন। বহুদিন পরে এরূপ খবর পাইয়া তিনি একটু দমিলেন—কেননা তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ব্যাপারটা রীতিমত গুরুতর দাঁড়াইয়াছে। তিনি পূর্ব্ব হইতেই সব গোছাইয়া রাখিলেন এবং যেদিন সকালে তাঁহার দেবর আসিবেন, সেদিন ভোরের বেলায় সেখানে গিয়া রান্না চড়াইয়া দিলেন—বিপদের দিনে তিনি না দেখিলে আর তাদের কে দেখিবে? ব্যায়রামী দেবর আসিতেছেন, সুতরাং ষ্টেশনে লোকজনসহ পাল্কী পাঠাইবারও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

রুগ্ন দেবর যখন গৃহে উঠিলেন, তাহাকে দেখিয়া সুরমা

প্রথমে চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। উঃ—কি অবস্থা হইয়াছে, একেবারে যে সে মানুষ চেনা যায় না! ধরাধরি করিয়া লোকজনে তাঁহাকে ঘরে উঠাইল—তাঁহার হাঁটিবার শক্তি নাই, পা পড়িয়া গিয়াছে। দুরারোগ্য পক্ষাঘাতে তিনি পঙ্গু।

দেবর-পত্নীর সে দর্পভরা তেজ কোথায়! আহা, সে বেচারা যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ঘরে ঢুকিয়াই সে সুরমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—"দিদি, আমার কি হবে। সতীলক্ষ্মীর অপমান করেছিলুম, তাই আজ আমার কপাল ভাঙতে বসেছে। তুমি রক্ষা না কর্‌লে এ বিপদে আমায় আর কে রক্ষা কর্‌বে বল। তুমি তোমার ঠাকুর দেবতাকে ডাক, দিদি, তাঁরা নিশ্চয় তোমার কথা শুন্‌বেন।"

যতীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে সুরমা ছেলে মেয়ে লইয়া আবার স্বামীর ভিটায় উঠিয়া আসিলেন।

কিছুতেই যতীন্দ্রনাথের পীড়ার উপশম হইল না। দিন দিন তাঁহার অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। তিনি বেশ বুঝিলেন যে এই পীড়াতেই তাঁহার শেষ হইবে। তাঁহার ডাক আসিয়াছে।

* * * *

যতীন্দ্রনাথের রোগশয্যার নিকটে সুরমা বসিয়া আছেন। তখন সে ঘরে আর কেহ ছিল না, যতীন্দ্রনাথ ডাকিলেন "বৌদি", সুরমা সে ডাক শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, কেন না গলার আওয়াজ বড় কাতরতাপূর্ণ। ব্যথিত অন্তরে তিনি উত্তর দিলেন—"কেন ঠাকুরপো।" যতীন্দ্রনাথ কহিলেন—"বুঝ্‌তে পার্‌ছ ত, বৌদি, এবারে আমার ডাক এসেছে, আমায় যেতে হবে।"

আকুলকণ্ঠে সুরমা কহিলেন—"ছি ঠাকুরপো, ওকি অলক্ষণে কথা। ও ছাই পাঁশ কথা মুখে আনতে নেই।" তাঁহার কথা শুনিয়া যতীন্দ্রনাথের অধরপ্রান্তে একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিল। সে হাসি দেখিয়া সুরমা শিহরিয়া উঠিলেন। অবশেষে যতীন্দ্রনাথ কহিলেন—"সে যা হ'ক গে যাক, আমি তোমাকে গোটাকতক কথা বলতে চাই।" সুরমা বলিলেন—"কি বলবে বল।" যতীন্দ্রনাথ বলিলেন—"আমি বলছিলাম, বউদি, দাদার খেয়ে পরে আমি মানুষ, কিন্তু আমি কি নেমকহারামের কাজই না করেছি—আমার মতন নেমকহারামেই ত দুনিয়ার পাপের ভার বাড়াচ্ছে। আমি তোমাদের কি সর্ব্বনাশ না করেছি, কিন্তু আশ্চর্য্য তবুও তুমি একদিনের জন্যও অভিসম্পাত দাও নি, আমার সমস্ত অপরাধ বরাবরই হাসিমুখে ক্ষমা করে এসেছ, আমার সমস্ত অত্যাচার বুক পেতে নিয়েছ। চিরদিনই আমাকে আশীর্ব্বাদ করেছ, কিন্তু দেবীর অপমান দেবতা সহ্য করলেন না—দেবতার অভিসম্পাতে পড়লুম। এত পাপ ধর্ম্ম সহ্য করবে কেন? তাই ইহজীবনে ব্যায়রামের মধ্য দিয়ে ভারি রকমের দণ্ড ভোগ করতে হচ্ছে। ইহকালে আমার সর্ব্বস্ব গেছে, আমার পরকাল অন্ধকার। যা' হবার তা' হয়ে গেছে কিন্তু যাবার আগে আমাকে কতকটা ধারশোধ দিয়ে যেতে হবে, পাপের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে হবে। বৌদি, তুমি জমিদার বাবুকে একবার আমাদের বাড়ীতে আনাতে পার? আমার একটা বিশেষ দরকার আছে, সে কাজটা যদি সেরে যেতে না পারি, যদি সেটা বাকি থেকে যায়, বড় অশান্তি নিয়েই তাহলে আমাকে সংসার থেকে চলে যেতে হবে। বৌদি, বড় জ্বালায় প্রাণ মন আমার সব

জ্বলে গেছে। আমার উপায় কি হবে?" শেষের কথাগুলা যতীন্দ্রনাথ বড় হতাশ ভাবেই বলিলেন।

সুরমা কাঁদিতেছিলেন, নিজেকে কতকটা সাম্‌লাইয়া বলিলেন "ঠাকুরপো, জীবনে কার না ভুল, ত্রুটী, অপরাধ আছে? এই অসুখের সময় অমন করে ভাব্‌লে যে শরীর মাটী হ'য়ে যাবে। ঈশ্বর বিচারক, তাই তিনি দণ্ডদাতা, যিনি দণ্ড দিতে পারেন, তিনি ত আবার ক্ষমা করতেও পারেন। মানুষ যখন নিজের ভুল বুঝ্‌তে পারে, যখন সে নিজেকে শোধ্‌রাতে চায়, যখন সে নিজেকে ছেড়ে দেবতার করুণার উপর নির্ভর করতে শেখে, তখন তিনিইত তার হাত ধরে এসে দাঁড়ান, পথহারা তাঁরই আলোকে ত চল্‌বার পথ দেখ্‌তে পায়। কোন্‌টা ন্যায় আর কোন্‌টা অন্যায় এ বুঝ্‌বার শক্তি তিনিত সবাইকে দিয়েছেন, সহজ পথটাকে বুদ্ধির দোষে আমরাইত বাঁকা করে তুলি—ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে চল্‌তে গিয়েই না আমরা পদে পদে ঠকি, অনেক ঠেকে এবং অনেক ঠকেও আমাদের ত চেতনা সব সময় হয় না, নিজের জ্ঞান আর বুদ্ধির ওপর জীবনটাকে যে ঠিক খাড়া রাখা যায় না, সেটা বোঝ্‌বার চেষ্টা কয়জনে করে, সেইজন্যেই না শয়তান আমাদের ঘাড়ে ধরে ভুল পথে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ঠাকুরপো, তুমি যে নিজের ভুল বুঝ্‌তে পেরেছ এবং তোমার নিজের অপরাধের জন্য তোমার মনে যে গ্লানি উপস্থিত হয়েছে, জেন, এর মধ্যেও ঈশ্বরের করুণা কাজ করছে। অনন্ত যাঁর করুণা, চিরদিন শাস্তি তাঁর বিধান হতে পারে না। ঠাকুরপো, অমন করে মিছে মন খারাপ কর না। জীবন থাক্‌তে তার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হয়। দেবতার দয়ায় ভুলেও কোন দিন অবিশ্বাস কর না। আশীর্ব্বাদ করি,

ঠাকুরপো, তুমি যেন মনের নষ্ট শান্তি ফিরে পাও।" এই বলিয়া তিনি সেখান হইতে উঠিলেন। যতীন্দ্রনাথের আহারের সময় ও হইয়াছে, খাবার প্রস্তুত হইয়াছে কিনা দেখিতে গেলেন।

হরিমোহন চৌধুরী ইহার মধ্যে যতীন্দ্রনাথকে একদিন দেখিয়া গিয়াছেন। কয়েকদিন ধরিয়া দুই একদিন অন্তর কেন যে তিনি ঘন ঘন আসিতেছেন, তাহার কারণ কেহই জানে না।

ইহার কিছুদিন পরে যতীন্দ্রনাথ এক তাড়া কাগজ সুরমার হাতে দিয়া বলিলেন—"বৌদি এই কাগজের তাড়াগুলা তোমার কাছে রেখে দিও।" সুরমা পড়িয়া বুঝিলেন যে সেই সমস্ত কাগজ পত্রে যতীন্দ্রনাথ তাঁহার ছেলে মেয়ের নামে বিষয় সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছেন। সোপার্জ্জিত নগদ টাকার অধিকাংশ রমাকে দিয়াছেন—তার বিবাহের সময়ে খরচ আছে ত।

সুরমা সমস্তখানি পাঠ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, তারপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "ছোট বৌকে কিছু না দেওয়াটা কিন্তু ভারি অন্যায় হয়েছে।"

"কিছুই অন্যায় হয়নি, বৌদি, ওর সমস্ত অভাব ও দূর করতে পারবে, এমন সম্পত্তি যখন পেয়েছে তখন পৃথক্ ভাবে, কিছু দিয়ে যাবারত দরকার দেখিনি। অনেক পুণ্যের বলে, বৌদি, ও তোমায় পেয়েছে—তুমিইত ওর অমূল্য সম্পত্তি রয়ে গেলে। অনেক ভেবে চিন্তে আমি যা ক'রে দিয়ে গেলাম, তাকে আর উল্টোতে চেয়ো না। ধীরেন আমাদের বেঁচে থাক্, সেই তার কাকিমার সর্ব্বস্ব।" ইহার উপরে আর কোনও কথা বলা চলে না- কাজেই সুরমা নীরব হইলেন।

কিছুদিন পরে সুরমাদের গৃহে একদিন রাত্রে ক্রন্দনের রোল উঠিল, প্রতিবেশীরা সকলেই বুঝিল যে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে যতীন্দ্রনাথ মনের নষ্ট শান্তি অনেক পরিমাণে ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

রীতিমত শিক্ষা

শ্যামলা কালো মেয়ে—কালো হ'লে কি হয়, তার কালো রঙে বেশ একটা উজ্জল-শ্রী আছে, তার হরিণের মত বড় বড় চোখ, তুলি দিয়ে আঁকা সরু টানা টানা ভুরু, মেঘের মতন কালো থোবা থোবা চুল, মুক্তার মত ঝক্‌ঝকে দাঁত, পাৎলা পাৎলা ঠোঁট দুখানিতে, তাকে বেশ মানায়। সব চেয়ে তার মুখখানি বড় সুন্দর, কেমন একটা কমনীয় স্নিগ্ধ ভাব সে মুখে সব সময়ে ফুটে আছে। কালো রঙয়ের মধ্যে কে যেন তার সর্ব্বাঙ্গে রূপ ঢেলে দিয়েছে।

শ্যামলা তার বাপ-মায়ের প্রথম সন্তান। কলিকাতায় পটলডাঙ্গার তাদের বাস। তার বাপ হরনাথ বসু সামান্য অবস্থার লোক। সওদাগরী আফিসে ৭০৲ বেতনে তিনি কাজ করেন। কলিকাতার বাড়ীখানা পৈত্রিক ভিটা। শ্যামলার দুটী ছোট ভাই আছে। সে তাদের কোলে পিঠে করে নিয়ে বেড়ায়। মা সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকেন, সব সময়ে ত তাদের দেখে উঠ্‌তে পারেন না, তাই শ্যামলার উপরে তাদের দেখার ভারটা পড়িয়াছে—ধীর শান্ত ছোট মেয়েটী ছোট্ট ভাই দুটীকে নাওয়ায় খাওয়ায় এবং বায়না ধর্‌লে তাদের ঠাণ্ডা ও করে।

শ্যামলা আগে আগে স্কুলে যেত কিন্তু এখন আর সে স্কুলে যায় না—এখন যে সে ডাগর হয়েছে! তা বলে সে কিন্তু লেখা পড়ার সঙ্গে সম্পর্কটা একেবারে তুলে দেয় নাই। দুপুর বেলা ঘুমিয়ে কিম্বা তাস খেলে সময় কাটিয়ে দেয় না;

সমস্ত দুপুরটা পড়ে কিম্বা "উল" বুনে। বিকেল বেলায় 'কাপড় কাচার' পর সে ছাদের উপর একটু বেড়ায় এবং সন্ধ্যা হতে না হতেই ছাদ থেকে নেমে এসে পিতার হাত মুখ ধুইবার গাড়ু গামছা ঠিক করে রাখে। তাঁর হাত মুখ ধোয়া হলে, সে জলখাবার এনে দেয়—তিনি খেতে বস্‌লে গ্রীষ্মকাল হলে সে পাখার বাতাস কর্‌ত। রাত্রে খাওয়া দাওয়াব পর যেদিন সুবিধা হইত, সে দিন সে বাপের কাছে ইংরাজী পড়া বলে নিত, এম্নি করে নিজের যত্নে সে একটু আধটু ইংরাজি ও শিখিতেছিল। পাড়ার সকলে বল্‌ত "আহা, শ্যামল, বড় ভাল মেয়ে, ভগবান ওর ভাল করুন।" তার মিষ্ট স্বভাব আর মিষ্ট হাসি, এই দুটো জিনিস সকলকে আকর্ষণ কর্‌ত।

মা যখন রাঁধিতে যান, শ্যামলা তার 'জোগাড়' দেয়। ছেলে-বেলা থেকেই তার কাজের অভ্যাস হয়ে গেছে। সব কাজই সে বেশ গুছিয়ে এবং পরিচ্ছন্ন ভাবে করে। আফিস যাবার আগে তার পিতা যখন আহারে বসেন সে তখন তাঁর কাছে গিয়ে বসে —সে কাছে না বস্‌লে তাঁর খাওয়া হয় না! যখন সে খুব ছোট্ট ছিল, তখন সে পিতার কোলে বসিয়া রোজ তাঁর সঙ্গে খাইত এখন তাঁর খাওয়া শেষ হয়ে গেলে তাঁর 'পাতে' বসে।

শ্যামলা অনেক কাজ করে কিন্তু তার মা তাকে কোনমতেই রাঁধ্‌তে দিতে চান না, 'আইবড়' মেয়ে যদি হাত পা পুড়িয়ে ফেলে! সে এই বয়সেই অনেক রকম রাঁধ্‌তে শিখেছে, তবে যখন সে নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে, তখন কোনো কোনো দিন তার মা তাকে রাঁধ্‌তে দেন কিন্তু যেদিনই সে রাঁধে, তার মা বরাবর কাছে দাঁড়িয়ে থেকে পাহারা দেন, কি জানি অসাবধানে যদি সে হাত পা

পুড়িয়ে ফেলে! মায়ের প্রাণ কিনা, সব সময়ে তাই আগ্‌লে আগ্‌লে ফিরে। সে কখনও কখনও মাতার এই অতি-সাবধানতা দেখিয়া হাসিয়া বলিত "আচ্ছা, মা, আমি কি বরাবরই খুকিটি থাক্‌ব। আমায় রাঁধতে দিতে এত ভয় পাও কেন?" মাতা বলিতেন "মেয়েমানুষ যখন হয়েছিস বাছা, তখনত রাঁধতেই হবে। আপনার ঘরদোর হোক, মনের সাধে রাঁধিস বাড়িস। মা লক্ষ্মি, তুই যে আমার দুধের বাছা, আগুণের আঁচে তোর কচি মুখ যে ঝল্‌সে যায়। আমাদের পাকা হাড়ে সব সয়।"

শ্যামলা যেদিন রাঁধে তার পিতা আহারে বসিয়াই অম্নি বলেন যে "আজ কে রেঁধেছে আমি বলে দিতে পারি। মা লক্ষ্মি, শ্যামল তুই যেন মা অন্নপূর্ণা।"

এই দরিদ্র পরিবারটী সুখ শান্তিতে ভরা। কিন্তু চিরদিন সুখ যখন কাহারও ভাগ্যে ঘটে না, তখন হরনাথ বাবু এমন কি ভাগ্য করেছেন যে চিরসুখে তাঁর দিন কাট্‌বে। দিনের পর দিন যেমন যাইতে লাগিল সকলের বয়স বাড়িতে লাগিল—শ্যামলাও দেখিতে দেখিতে চৌদ্দ বৎসরে পদার্পণ করিল। আর ত তাহাকে বেশীদিন রাখা চলে না। হিন্দু ঘরের মেয়ে যেমন করিয়াই হোক বিবাহ দিতেই হবে—নইলে ধর্ম্ম যাবে লোকে একঘরে করিবে যে! সময়ের অনিবার্য্য নিয়মে হরনাথ দেখিলেন কন্যার বয়স বাড়িয়াছে কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার টাকা ত বাড়ে নাই, এবং হঠাৎ যে বাড়িবে তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। তাই হরনাথ মনে মনে একটু দমিলেন।

গৃহিণী প্রায়ই অনুযোগ করিতেন "ওগো, তুমি ত বেশ নিশ্চিন্তি বসে আছ মেয়ের বিয়ে না দিলে যে আর জাত কুল বজায়

থাক্‌বে না!” শুষ্ক কণ্ঠে হরনাথ বলিতেন “সব বুঝি গিন্নি, সব বুঝি, ছেলের বাপেরত হাঁকাই মেটাতে হবে, সবাইয়ের এক হাঁক টাকা চাই। আমার মেয়েকে ত যার তার হাতে ধরে দিতে পার্ব্ব না। আমাদের একটি মেয়ে ও-যে বড় আদরের; যেমন করে হোক ভাল ঘরে বরে দিতেই হবে।” মেয়ের বিয়ে যে কন্যাদায় হরনাথ এখন বেশ বুঝিতেছেন।

হরনাথ এখন আর নিশ্চিন্ত বসিয়া নেই, অনেকে হাঁটাহাঁটি করছে, অনেক জায়গা থেকে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধও আস্‌ছে কিন্তু কোনটাই তাঁর মনে ধর্‌ছে না। বউবাজারের হরিশ্চন্দ্র ঘোষের ছেলে যতীশচন্দ্রের সঙ্গে যখন সম্বন্ধ এল, সেইটেই তাঁর মনের মত হল। ছেলে এম, এ, পাশ করিয়াছে, স্বভাব চরিত্র খুব ভাল—দেখিতে শুনিতেও বেশ। এ হেন পুত্রের পিতার যে লম্বা হাঁকাই হইবে, সেটা হরনাথ বুঝিয়াছিলেন। তবু কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল—শেষ দাঁড়াল এই, হরনাথ নগদ ৩০০০৲ এবং গহনা বাবৎ ১৫০০৲ যদি দিতে পারেন তবেই এ বিবাহ হবে, নতুবা ব্যস এই পর্য্যন্ত! কি করেন এমন পাত্র হাত ছাড়া হয়ে যায় সুতরাং তিনি রাজি হলেন।

রাজি হলেন ত কিন্তু টাকা কোথা হইতে আসে? এদিকে পাকা দেখা হইয়া গিয়াছে—পাত্রের পিতা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন। যতীশচন্দ্রকে অনেকে পরামর্শ দিয়াছিল যে সে নিজে গিয়ে একবার মেয়ে দেখে আসুক কিন্তু সে তাহা করে নাই—কেননা তার মনে হয়েছিল ওটা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। বাপ মা যা’ ভাল বুঝবেন সেই আমার ভাল। ছি! তাঁদের উপর কথা।

যতই দিন কাটিতে লাগিল ততই হরনাথের ভাবনা বাড়িতে লাগিল বিবাহ যে শীঘ্র দিতে হবে। এত টাকা তিনি কোথায় পাবেন? তিনি যাহা রোজগার করেন তাহাতে টাকাত জমে নাই! স্বামী স্ত্রীতে খুব পরামর্শ চলিতে লাগিল—শেষে দাঁড়াইল যে আপাততঃ বাড়ী বন্ধক দিয়া টাকার জোগাড় করা হউক। তা ভিন্ন আর অন্য উপায়ও নাই। বাড়ী বন্ধক দিয়া ৫০০০৲ জোগাড় হইল। হরনাথের হাতে টাকাটা যখন আসিল কি জানি কেন তাঁর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল!

শ্যামলাও সব শুনিতে পাইল। তার বিয়ের জন্য বাড়ী বন্ধক পড়িল এবং বোধহয় মাতার গায়ে দুই চার খানা যাহা সামান্য অলঙ্কার আছে তাহাও যাইবে। এই শান্তিময় ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত সুখ যে তাহার জন্য নষ্ট হইতে চলিল! চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা যখনই এই কথাটা ভাবে তখনই একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাহার ক্ষুদ্র কোমল প্রাণ ছটফট করিতে থাকে। সে যে তার পিতা-মাতার বড় আদরের! এত আদর, এত স্নেহের প্রতিদানে, সেত আজ তাঁহাদের জন্য সর্ব্বনাশের পথ খুলিয়া দিতেছে! বাপ মায়ের সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই কি সে এসেছে? সে যদি মরিত তাহা হইলে বেশ হইত! ব্যথিত হৃদয়ে আকুল প্রাণে সে কতবার মৃত্যুকে ডাকিল কিন্তু মৃত্যু তার ডাক শুনিল না।

যতই দিন যাইতে লাগিল, শ্যামলা ততই ম্লান হইয়া পড়িতে লাগিল—বালিকার অব্যক্ত মর্ম্ম-কাতরতা তাহাকে শুধু অন্তরে অন্তরে পীড়ন করিতে লাগিল।

আজকাল শ্যামলা কেমন ভার-ভার মুখে চলে ফেরে; কি এক

রকম অন্যমনস্ক ভাবে থাকে। প্রথমে তাহার জননী ভাবিয়াছিলেন যে বিয়ের কথাতে বোধহয় এরূপ হইয়াছে, কিন্তু কি জানি তাঁর মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিল, তাই একদিন তিনি কন্যাকে জিগ্‌গেস করিলেন "হারে, শ্যামলি, তোর কি হয়েছে রে?" "কি আর হবে মা"। বিস্মিতা মাতা কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে বেদনার স্পষ্ট চিহ্ন কন্যার সুন্দর মুখখানির উপর নিজের কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে। দুঃখ কেন, বেদনা কিসের? তাই তিনি আবার বলিলেন "শ্যামলি তোর খুব ভাল ভাগ্যি যে তুই এমন ঘর বর পাচ্ছিস্। তুই কোথায় হেসে খেলে বেড়াবি না দিনরাত ভেবে ভেবে শরীরটাকে মাটি করছিস্।" মায়ের কথা মেয়ের মর্ম্ম-স্পর্শ করিল, তার বড় বড় চোখ দিয়ে ঝরঝর করে শুধু জল পড়িল। ব্যথিতা কন্যাকে বুকে টানিয়া লইয়া মাতা তাহার মুখ চুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "কেন মা, কান্না কিসের?" শ্যামলা ম্লান মুখে শুধু বলিল, "মা আমার বিয়ে দিও না। যাতে তোমাদের সবাইয়ের সর্ব্বনাশ হচ্ছে, তাতে আমার কখনও সুখ হবে না।" মা তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, সমস্ত জিনিষটা সে ভাল করে না বুঝলেও এটুকু সে বেশ বুঝিল, যে এ ক্ষেত্রে তার আপত্তি টিঁকিবে না।

* * * *

"মা, মা"—"কেন বাবা যতীশ।"

"মা আমার একটা কথাও রাখ্‌তে পাল্লে না।"

"কি বল্‌ছিস্, যতীশ?"

"আমি বল্‌ছিলাম, এই তোমরা যাকে দেখে পছন্দ করে বাড়ীর বৌ করতে চাইছ, আমি তাকে না দেখেই বিয়ের মত দিয়েছি; তবে একটা কথা এই হচ্ছে যে আমি তোমাকেত বরাবর বলে এসেছি বিয়েতে টাকা নেওয়াটা হবে না।"

"কেউতো ছাড়ে না, বাবা, সকলেই ত নিয়ে থাকে।"

"সকলের কথা ত ভাববার আমার দরকার নেই, মা, আমি কি কচ্ছি, সেইটে আমাকে দেখ্‌তে হবে। সকলে হয়ত এটাকে অন্যায় মনে করে না, কিন্তু আমি যে মা, এটাকে অন্যায় মনে করি। জেনে শুনে অন্যায় করলে অপরাধ যে গুরুতর হয়, মা।"

"তা'হলে তুই না হয়"—

"না, মা, শোন, আগে আমার কথা শেষ কর্ত্তে দাও। নগদ ৩০০০৲, গয়নাগাঁটিতে ১৫০০৲, এবং অন্যান্য খরচ সেও ধর ১৫০০৲ মোটমাট ৬০০০৲ খরচ করবার অবস্থা তাঁদের নয়; তবু তাঁরা খরচ করছেন! তাঁদের আদরের মেয়েকে সুখে রাখবার জন্য বাপ মা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছেন। আর আমি তাঁদের মেয়েকে বিয়ে করার নামে জবাই করতে যাচ্ছি! মা, আমার মনুষ্যত্বকে এম্নি করে ডুবিয়ে দিতে চাও?"

"তা'হলে তুই না হয় একবার ওঁকে বলে দেখ্‌না।"

"না, মা, বলায় কোন কাজ হবে না, আমি বাবাকে বুঝিয়ে দিতে চাই।" যতীশের মাতা কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন—"দেখ্‌ যতীশ আমি কিন্তু বাপু ওঁকে বলেছিলাম যে যতীশ টাকা নিয়ে বিয়ে কর্ত্তে চায় না। তাতে উনি বল্লেন কি জানিস, যে হাঁ ওদের এখন রক্ত গরম কিনা, ওরা এসব কথা বল্‌তে পারে, একটু বয়স হলেই বুঝ্‌তে পার্ব্বে যে ওসব

বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই আমার মেয়ের বিয়ের সময় ছেলের বাপ কি ছেড়ে কথা কইবে ?"

"মা, অনেক দিনের অন্যায়টাকে তাড়াতে গেলে জন কয়েকের একটু ত্যাগ স্বীকার কর্ত্তে হয়। অন্যায়টা বুঝ্‌তে বেশী কষ্ট হয় না কিন্তু সেটাকে তাড়াতে হলে অনেক কষ্ট স্বীকার কর্ত্তে হয়, সেইটে আমরা করিনি বলেই আমাদের দেশে অন্যায়গুলো পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলে।"—এই বলিয়া যতীশচন্দ্র চলিয়া গেল।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। ১০ই অগ্রহায়ণ বিবাহ।

দেখিতে দেখিতে অগ্রহায়ণ মাস আসিল। বিবাহের আর মাত্র বাকি—দুইদিন। শ্যামলাদের বাড়ী আত্মীয় কুটুম্বে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আজ গোধূলি লগ্নে বিবাহ। শ্যামলাদের বাড়ীতে সকলেই ব্যস্ত। ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল—পশ্চিমাকাশে সূর্য্যদেব ঢলিয়া পড়িতেছেন; ঝির্ ঝির করিয়া হিমের হাওয়া বহিতেছে। কখন বর আসিবে, কখন বর আসিবে, সকলের মুখে এখন এই কথা। কিছু পরে গোল উঠিল ওই বর আস্‌ছে, ওই বর আস্‌ছে। সত্য সত্যই বর আসিল।

মেয়ে মহলে গোল পড়িয়া গেল।

"উলু দে না লো।"

"শাঁক বাজা না।"

"ও বামীর মা কোথায় গেলি লা, ছেলেটাকে ধরবে, না, মাগি, ঠিক সময় বুঝে পালিয়েছে।"

"চারুর মা, তুমি ভাই করছ কি, এখনও তোমার যে দেখ্‌ছি

কনে সাজান হয়নি। চট্ করে সেরে নেও দিদি আর কি সময় আছে। বিয়ের লগ্ন যে ঠিক সন্দেয় গো।”

দেবতাকে সাক্ষী করিয়া এই অচেনা অজানা বালিকার সমস্ত ভার, সেদিনকার শুভলগ্নে যতীশচন্দ্র গ্রহণ করিলেন। শুধু একবার শুভদৃষ্টির সময় চারি চক্ষুর মিলন হইয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে শ্যামলার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িয়াছিল। একটি নিশ্বাস তাহাতেই যে অনেকখানি প্রকাশ হইয়াছিল! বিবাহের সমস্ত আনন্দের মধ্যে খোকা-বধুর প্রচ্ছন্ন মনোবেদনা যতীশচন্দ্রের হৃদয়ে গিয়া আঘাত করিতে লাগিল। সে বেদনা যে তাঁহারই ললাটে কলঙ্কের ছাপ দিতে চাহিতেছে। তাঁহার অন্তরে কে যেন তাঁহাকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

ছাঁদ্‌নাতলায় যখন তিনি শুনিলেন ঃ—

“কড়ি দিয়ে কিনলুম, দড়ি দিয়ে বাঁধলুম,
হাতে দিলাম মাকু,
একবার ভ্যা কর ত বাপু।”—

তখন বাস্তবিক সেটা বিদ্রূপের ন্যায় তাঁহাকে পীড়ন করিল। হাঁ, সত্যই, তিনি “ভ্যা” করিবার উপযুক্ত বটে!

যাহা হউক, মুহূর্ত্তে তিনি যে-টুকু দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নব-বধুর মুখখানি সুন্দর, বিষাদে ম্লান বলিয়া বোধ হয় সে মুখ আরও সুন্দর দেখাইয়াছিল।

পরদিন যতীশের পিতা বধু জামাতাকে লইতে আসিলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন যে যতীশ বড় বিলম্ব করিতেছে, তখন তিনি তাহাকে তাড়া দিলেন। নব-বিবাহিতা শ্যামলা ও তাহার পিতামাতা যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরে তাঁহাকেও

নিয়ে যাওয়া হ'ল। হরিশচন্দ্র বলিলেন—"যতীশ, আর দেরী করনা, একটু শিগ্‌গির সেরে নেও।"

যতীশ কহিল "কেন বাবা?"

"যতীশ কি বলছ আমি যে তোমাদের নিতে এসেছি।"

এইবার যতীশ কহিল "শুনুন, আজ পর্য্যন্ত আপনার কথাব কখনও অবাধ্য হইনি কিন্তু আপনি আমাকে এমন অবস্থায় ফেলেছেন, আপনার কথা শোনাও আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। এঁরা অনুমতি দিলেও আমি আজ যেতে পাচ্ছি না, আপনি আমার উপর এখন ঠিক আর কোনও দাবি করতে পারেন না আমার যা দাম তা এঁরা কড়ায় গণ্ডায় আপনাকে চুকিয়ে দিয়েছেন। আপনার পাওনা আপনি নিয়েছেন, আমাকে ধার শোধ করে যেতে হবে। আপনি মাপ কর্ব্বেন, আমার ফিরে যাবার স্বাধীনতা আজ আর নেই, দেনা চুকিয়ে দিয়ে যেদিন স্বাধীন হ'ব, সেদিন আবার আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হ'ব—আজ আমি এঁদের কেনা গোলাম।" সকলে অবাক হইয়া যতীশের কথা শুনিলেন—একহাত ঘোমটার মধ্য হইতে শ্যামলার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

দুইদিন পরে খুব ধুমধামের সহিত বউভাত হইয়া গেল—বলা বাহুল্য হরিশচন্দ্র বেহাইকে সমস্ত টাকা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

স্নেহের জয়

৪০ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে মিস্ লিলিয়ান মারে তবু বিবাহ করেন নাই। তিনি সুশিক্ষিতা ও সুলেখিকা, তাঁর এক এক খানা উপন্যাস যখন বাহির হয় তখন সমস্ত ইংলণ্ডে হৈচৈ পড়িয়া যায়। সংসার হিসাবে তাঁর আপনার লোক বড় কেহ নাই, দূর সম্পর্কের যে দুই চারিজন আছেন, তাঁহারা মিস্ মারের বড় একটা খোঁজ খবর রাখেন না—সুতরাং তিনি একা।

বই লিখিয়া মিস্ মারে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেন। লণ্ডন সহরের উপকণ্ঠে কোন পল্লীগ্রামে তিনি বাস করেন। কাজের জন্য যদিও প্রায় তিনি লণ্ডন সহরে যান, সহরের লোকের ভিড়, কাজের হুড়ামুড়ি এবং ব্যস্ততা তিনি পছন্দ করিতেন না—পল্লী-জীবনের শান্তি, শ্রী এবং নির্জ্জনতার মধ্যে তাই তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ম্যাকডোণাল্ড পরিবার মিস্ মারের প্রতিবেশী।

ম্যাকডোণাল্ডদের একসময়ে অবস্থা বেশ ভালই ছিল, কিন্তু ভাগ্যচক্র চিরদিন সমান যায় না! তাঁহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মিস্ মারে ও ম্যাকডোণাল্ড পরিবারের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। মিস্ মারের নিকট হইতে এই দরিদ্র পরিবার নানাভাবে সাহায্য পাইয়া থাকেন, সেজন্য তাঁহারা মিস্ মারের

নিকট খুবই কৃতজ্ঞ। ম্যাকডোণাল্ড পরিবারের ছেলেপিলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অত্যাচার তাঁহাকেই বেশী সহ্য করিতে হইত। বিশেষতঃ দুই বৎসরের শিশু রবার্ট ম্যাকডোণাল্ড বাস্তবিকই তাঁহার বড় প্রিয়। সে যখন তার কচি কচি হাত দুখানি বাড়াইয়া তাঁর কোলে ঝাপাইয়া পড়িত বাস্তবিক তখন তাঁর সমস্ত হৃদয় কি একটা মহান্ আনন্দের স্রোতে ভাসিয়া যাইত। তার ক্ষুদ্র বাহু দুটীর স্নেহের বন্ধন এত প্রবল।

রবার্টকে সকলেই বব্ বলিয়া ডাকে। বব্ অনেক সময় তাঁরই কাছে থাকিত। মাতৃনির্ব্বিশেষে তিনি তার সেবা ও শুশ্রূষা করিতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে বব্‌কে তিনি মনের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিবেন। লণ্ডনে তিনি যখন যাইতেন এই পরিবারের ছেলে মেয়েদের জন্য ভাল ভাল খেলানা, মিষ্টান্ন এবং পোষাক কিনিয়া আনিতেন—বিশেষতঃ শিশু ববের জন্য।

ববের যখন ৮ বৎসর বয়স—সে গ্রামের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইল। এই সময়ে ববের পিতামাতাকে মিস্ মারে বলিলেন যে, ববের শিক্ষার ভার তিনি লইতে চান। তাঁরা এই প্রস্তাবে নিজেদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান ও সম্মতি দান করেন। গ্রাম্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে ববের সম্পর্ক এইখানেই শেষ হয়।

ইহার পরে লণ্ডন সহরে কোন ভাল বোর্ডিং বিদ্যালয়ে মিস মারে বব্‌কে ভর্ত্তি করিয়া দেন। শীতকালে যখন দীর্ঘকালের জন্য স্কুল বন্ধ হয়, সেই সময়ে বব্ বাড়ীতে আসিত। বলা বাহুল্য যে মিস্ মারের গৃহেই সে অধিকক্ষণ থাকিত। সে বালক-স্বভাবসুলভ কত গল্পই না করে—ফুটবল খেলার, ক্রিকেট খেলার,

হকি খেলার এবং সাঁতার কাটার এ সব গল্প সে কতবারই না মিস মারের নিকট করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় মিস্ মারে এসব বারবার শুনিয়াছেন তবু যতবারই বব্ বলে ততবারই বেশ আগ্রহের সহিত শোনেন একটুও বিরক্তি বোধ করেন না—ববকে তিনি এমনি গভীর ভালবাসেন, যে ববের কিছুই তাঁর নিকট অপ্রিয় মনে হয় না।

বব্ কিরূপ লেখাপড়া করিতেছে সে বিষয়ে মিস্ মারে কোনদিনই উদাসীন ছিলেন না—লণ্ডনে তিনি যখন যাইতেন তখন প্রায়ই ববের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতেন। শিক্ষকদের নিকট তার সম্বন্ধে খোঁজ খবর করিতেন—সকলেই ববের উপর সন্তুষ্ট, সে লেখা পড়াও বেশ করিতেছে।

ক্ষুদ্র বব্ বড় হইয়া উঠিল—এখন তার আঠারো বৎসর বয়স। স্কুলের পড়া তার শেষ হইয়াছে—সে বাড়ী আসিয়াছে। মিস্ মারের নিকট এখনও সে যায় আসে। কিন্তু সহসা ববের একি হইল, তাহার মধ্যে পূর্ব্বেকার সেই আকর্ষণ কোথায়,—তার কথাবার্ত্তা, আচরণ সমস্তই যেন কৃত্রিম—যেন তার অন্তরের জিনিস নয়! তাহার বাল্য চপলতা সম্পূর্ণরূপে ঘুচে নাই সত্য বটে, কিন্তু তাহার অন্তর-জিনিসটা এমন ভাবে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, যাহার ফলে তার বালক-হৃদয়ের স্বাভাবিক সরলতা চলিয়া গিয়াছে। তার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন কোন্ শিক্ষার দোষে ঘটিয়াছে? এখন উপায় কি? জীবনের পথে এইভাবে চলিলে যে তাঁর ববের সর্ব্বনাশ হইবে তাহাও তিনি বুঝিলেন। সমস্ত জিনিসেই এই-যে-কেমন একটা উদাসীন ভাব, ইহা শুভ লক্ষণ নহে। তিনি নিজের অসীম স্নেহের দ্বারা

ববের এই ভাবকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু পারিলেন না। মনের মধ্যে আঘাত পাইলেন। এই না সেই বালক—যাহাকে মনের মতন গড়িয়া তুলিয়া দশের এবং দেশের গৌরবরূপে দাঁড় করাইবেন! হায়, তাঁর মনের বাসনা বুঝি পূর্ণ হইবার নয়! নিঃসম্পর্কীয় ক্ষুদ্র শিশু যখন হাসিতে হাসিতে তাঁর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িত, মাতৃহৃদয়ের সার্থকতা, সেই না একদিন তাঁকে বুঝাইয়াছিল! আর আজ তার কতদূর পরিবর্ত্তন, যতই তিনি তাহাকে আপনার বুকের নিকট টানিয়া লইতে চান, সে আজ ততই দূরে চলিয়া যাইতে চায়! হায়, এ জগতে স্নেহের বন্ধন কি এতই দুর্ব্বল!

বব্ এখনও মিস্ মারের বাড়ী যাওয়া আসা করে। আজ সে মিস্ মারের কাছে আসিয়াছে। মিস্ মারে দেখিলেন যে, সে আজ যেন আরও একটু বেশী অন্যমনা, সে যেন তাঁকে কি বলিতে চাহে! ববের এই অদ্ভুত ব্যবহারে তিনি ব্যথিতা হইলেন এবং শেষে তিনি বাধ্য হইয়া তাহাকে বলিলেন "বব্, তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও, আমাকে বলতে তোমার এ বাধ-বাধ কেন? বব্, নিশ্চয়ই তুমি আমাকে আর ভালবাস না।" বব্ কেমন যেন একটু থতমত খাইল এবং অতি কষ্টে ঢোক গিলিয়া বলিল, "আজ্ঞে তা' নয়, আজ্ঞে তা' নয়, কথাটা আপনাকে বলব বলেইত এসেছি। আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন, আপনি যদি ১০০ পাউণ্ড দেন।" মিস্ মারে বলিলেন "বব্ তুমি ছেলে মানুষ, এত টাকা তোমার কিসে দরকার?" সে বলিল—"আমার ভবিষ্যতের উন্নতি এর উপর নির্ভর করছে, আমায় মাপ কর্ব্বেন, এর বেশী

এখন আর আমি কিছুই বল্‌তে পার্ব্ব না। আপনি যদি আমাকে অবিশ্বাস করেন তা হলে অবশ্য টাকা আমি চাই নে।” মিস্ মারে বলিলেন—“বব্, তুমি আমার বরাবর বড়ই প্রিয় কিন্তু এবারে তোমার ভাবান্তর দেখে আমার মনে বড় কষ্ট হচ্ছে, কোন বিষয়েই তোমার যেন মন নেই, সব তাতেই কেমন একটা উদাস ভাব। তোমার পরিবর্ত্তন হয়েছে, কিন্তু আমি ত তোমাকে অবিশ্বাস করিনি!” বলিয়া চেক বহি বাহির করিয়া লণ্ডনে কোনও ব্যাঙ্কের উপর ববের নামে ১০০ পাউণ্ডের একখানা চেক তখনি লিখিয়া দিলেন।

পরদিন সকালে বব্ সেই চেকখানা লইয়া ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইল। ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী চেকখানা লইয়া ববের হাতে একখানা চাক্‌তি দিলেন এবং খুব ভদ্রতার সহিত তাহাকে বলিলেন যে তাকে টাকা লইতে হইলে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে। কথাটা শুনিবামাত্রই সে কেমন চমকিয়া উঠিল এবং তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু উপায় নাই সুতরাং তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল।

ব্যাঙ্ক তখনি তাহাকে টাকা দিতে পারিত কিন্তু যে চেক পাশ করে, তার চেকটা সম্বন্ধে কেমন সন্দেহ হওয়াতে সে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে গিয়া বলে। ম্যানেজারও দেখিলেন যে সন্দেহটা নিতান্ত অমূলক নয়। টাকার জায়গাটা কেমন যেন গোলমাল ঠেক্‌ছে। ১০০ পাউণ্ডকে যেন ৪০০ পাউণ্ড করা হইয়াছে। সেই চেকখানা লইয়া তখনই একজন কর্ম্মচারী মিস্ মারের বাড়ীর দিকে গাড়ী করিয়া ছুটিল এবং মিস্ মারের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার হাতে চেকখানা দিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল “আপনার মনে

হয় কি চেকখানা ঠিক আছে? ব্যাঙ্কের সন্দেহ হচ্ছে চেকখানা ১০০ পাউণ্ডের ছিল, তাকে ৪০০ পাউণ্ড করা হয়েছে—খুব ভাল করে দেখ্‌লে হাতের লেখা যে তফাৎ সেটাও মনে হয়। আপনিই একবার ভাল করে দেখুন না, না হয়।" মিস্ মারে দেখিলেন এবং দৃঢ়স্বরে বলিলেন যে "না, ঠিক আছে।" ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী তাঁকে যে বিরক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে সেজন্য বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইল।

মিস্ মারে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। এইরূপ প্রতারণায় যাহার আরম্ভ তাহার শেষ কোথায়! অবশেষে বব্ তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করিল—এ যে স্বপ্নের অগোচর! তাঁর বুক-ভরা স্নেহের কি নিষ্ঠুর প্রতিদান! সে জাল করিয়াছে! —এতদূর অধঃপতন! তাঁর এত দিনের মনের সাধ এক দিনের ব্যাপারে একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল—হায়রে, মনের সাধ বুঝি কোনদিনই পূর্ণ হয় না! বব্ প্রতারক—উঃ, কি ভয়ানক কথা!

ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী ব্যাঙ্কে ফিরিয়া গিয়া সবিশেষ বলার পর, বব্ তার টাকা পাইল। সেও সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল। করুণাময়ী জননীরূপিণী মিস্ মারে যে তার আচরণে মৃত্যুযাতনা ভোগ করিবেন তাহাও সে বুঝিল। মুহূর্ত্তের প্রলোভনে, নিমেষের ভুলে, সে কি করিয়া বসিয়াছে! নিজের কার্য্যের জন্য নিজের উপর তার ঘৃণা জন্মিল। এ সংসারে যাঁহাকে সে দেবীর ন্যায় শ্রদ্ধা করে, আজ তাঁরই নিকট প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে সে জালিয়াৎ—প্রতারক। এই প্রতারণার মধ্যেও ত তাঁর করুণা

ও স্নেহ ফুটিয়া উঠিয়াছে, কেননা সমস্ত জিনিসটাকে তিনি যদি নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া না লইতেন, তাহা হইলে ফাটকের ফটক—তার উন্মুক্ত হইত। নিজের দুষ্কর্ম্ম অপেক্ষা এই দেবীহৃদয়ে সে যে দারুণ আঘাত দিয়াছে, সেই জন্যই সে বেদনা অনুভব করিল!

পরদিন সকাল বেলা যখন মিস্ মারে বাগানে পায়চারী করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁর ভৃত্য আসিয়া হাতে একখানা চিঠি দিয়া গেল। হস্তাক্ষর পরিচিত, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে বব্ চিঠি দিয়াছে—চিঠিখানা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বোধহয় এই অকৃতজ্ঞ বালকের মঙ্গলের জন্য তিনি তাঁর কাতর প্রার্থনা ভগবানের চরণে নিবেদন করিলেন। সাবধানে ধীরে ধীরে চিঠিখানা খুলিলেন, তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল :—

প্রিয় মহাশয়া,

যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। আমার গুরুতর অপরাধ যে আপনি ক্ষমা করিয়াছেন তাহা আমি জানি। আপনার স্নেহের ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব ইহাও জানি। আপনার মনে যেরূপ কষ্ট দিয়াছি যদি কখনও আমার কর্ম্মের দ্বারা আপনার সে কষ্ট নিবারণ করিতে পারি, তবেই আবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। যেমন করিয়া হউক, আমাকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তাহার জন্য যদি প্রাণ দিতে হয় আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন পশ্চাৎপদ না হই।

হতভাগ্য—

বব্।

* * * * *

কালের ঘণ্টা বাজিতেছে। সময় কাহারও মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে না। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। মিস্ মারে ববের যথেষ্ট খোঁজ করিয়াছেন কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। ববের জনক জননী তাহার সহসা এরূপ অন্তর্দ্ধানের কোনও কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না—মিস্ মারে শুধু কারণ জানিতেন কিন্তু সেটা তিনি কোনদিন কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই।

ঠিক এই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী বুয়রদের সঙ্গে ইংরাজ-রাজের তুমুল যুদ্ধ বাধিল। সমস্ত ইংলণ্ড রণোন্মাদে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল—চারিদিকে সাজ-সাজ রব পড়িয়া গেল। বিংশতি-বর্ষীয় যুবক রবার্ট ম্যাকডোণাল্ডের মনে যুদ্ধে যাইবার সাধ জাগিয়া উঠিল—সে গর্ডন হাইলাণ্ডার সেনাদলে নাম লিখাইয়া আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার সঙ্কল্প করিল।

আজ সকালবেলা ১০ টার সময় জাহাজ ছাড়িবে। ভোরে উঠিয়া বব্ একবার ডাকঘরে গেল, একটা পার্শেল পাঠাইল ও একখানা চিঠি ডাকে দিল। তারপরে আপনার জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া জাহাজে উঠিল। বহুলোকের ভিড় হইয়াছে। পুত্র পিতামাতার নিকট বিদায় লইতেছে, স্বামী স্ত্রীর নিকট বিদায় লইতেছে—প্রিয়জনের মঙ্গলকামনা এবং আশীর্ব্বাদ যেন রক্ষাকবচের ন্যায় বিপদ এবং মৃত্যুর মুখ হইতে যাহাকে ভালবাসে তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে! কর্ত্তব্যের আহ্বান এবং স্নেহের টান—কোনটাই উপেক্ষার বস্তু নয়! বব্ জীবনে যাহা ভাবে নাই, আজ তাহা ভাবিল। তাহার তরুণ হৃদয় এই করুণ বিদায়ের দৃশ্যে বিগলিত হইল। সে দেখিল সংসার সুন্দর;

বাস্তবিকই বড় সুন্দর! একা ডেকের উপর দাঁড়াইয়া সে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিল। এই বিপুল জনতার মাঝখানে সে-ই শুধু একা! কেন? তার সবই আছে কিন্তু সে যে ইচ্ছা করিয়া বিদ্রোহী সাজিয়াছে! সমস্ত মায়ার পাশ, স্নেহের বাঁধন সে যে নিজের হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে! পিতামাতার স্নেহ, ভাইবোনের ভালবাসা, সব মনে পড়িল। আর মিস্ মারে? আহা, এই করুণাময়ী রমণীর প্রাণে সে কি না কষ্ট দিয়াছে! এই সমস্ত ভাবনায় তা'কে আকুল করিল। তার চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া চোখ মুছিল। অদূরে ঢং ঢং করিয়া১০টা বাজিল, জাহাজ ছাড়িয়া দিল। তীরস্থ জনতার উৎসাহ ধ্বনিতে গগন মেদিনী পূর্ণ হইল।

সাগর বক্ষে জাহাজ ছুটিতে লাগিল। সৈনিকদল অনিমেষ নয়নে তীরের দিকে তাকাইয়া আছে। যুদ্ধের শেষ হইবে কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন আবার জননী জন্মভূমির কোলে ফিরিয়া আসিবে? ইংলণ্ডের তীরভূমি যখন আর দেখা গেল না, তখন ববের একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল। কে জানে ইহজীবনে সে জন্মভূমির মুখ আর দেখিতে পাইবে কিনা? কে জানে শত্রুর গুলিতে আফ্রিকার অরণ্যভূমিতে তার জীবলীলা সাঙ্গ হইবে কি না? যদি তাহাই হয়, ক্ষতি কি! আজ বিপন্ন মাতৃভূমি উপযুক্ত সন্তানের নিকট সেবা চাহিতেছেন—জননী জন্মভূমির জন্য যদি তাহার তুচ্ছ প্রাণ যায়, সেত গৌরবের কথা—কিন্তু জীবনের সমস্ত খেলা এত শীঘ্র শেষ হইয়া যাইবে! মৃত্যুকে সে ভয় করে না সত্য বটে, তবু এমন সুন্দর সংসারে এত অল্প বয়সে তাহাকে মরিতে হইবে!

বব্ যেদিন ইংলণ্ড ছাড়ে ঠিক তারপরের দিন সকাল বেলা মিস মারে যখন চা পান করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভৃত্য আসিয়া তাঁর হাতে একটা ক্ষুদ্র পার্শেল ও ডাকের চিঠি দিয়া গেল। এ যে ববের হাতের লেখা! নির্দ্দয় অকৃতজ্ঞ বালক, এতদিন পরে মিস্ মারেকে মনে পড়িল! তাড়াতাড়ি তিনি চিঠি খুলিলেন। চিঠিতে এইরূপ লেখা :—

প্রিয় মহাশয়া,

আজ পার্শেল যোগে আপনাকে সামান্য উপহার পাঠাইতেছি, গ্রহণ করিয়া সুখী করিবেন। আপনি যখন পত্র ও পার্শেল পাইবেন, তখন আমি ইংলণ্ড হইতে বহু দূরে। আমি দেশ-ত্যাগ করিলাম, কোথায় যাইতেছি, কেন যাইতেছি, এখন কিছুই বলিব না। যদি কখনও যোগ্যতা দেখাইতে পারি, তবেই আপনার নিকট আবার ফিরিয়া আসিব, নহিলে এই শেষ।

আপনার স্নেহের বব্।

পার্শেল খুলিয়া মিস মারে দেখিলেন যে একছড়া সুন্দর হার ও ক্রুশ। ববের স্নেহের দান, তখনই তিনি কণ্ঠে পরিলেন। তাঁর ব্যথিত হৃদয় এই স্নেহের দানে যেন শীতল হইল!

দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছিবামাত্রই, গর্ডন হাইলাণ্ডারদের উপর হুকুম হইল যে তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইবে। আফ্রিকার বনভূমি তখন মানুষের রক্তে লালে লাল হইয়া গিয়াছে। প্রবল ব্রিটানিয়া শক্তি কোনমতেই বুয়রদের বশে আনিতে পারিতেছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে গর্ডন হাইলাণ্ডার সেনাদলের সঙ্গে থাকিয়া বব্ও যুদ্ধ করিতে লাগিল।

একদিন প্রত্যূষে বিপক্ষদল প্রবল পরাক্রমে ইংরাজ সেনার উপর আক্রমণ করিল—উভয়পক্ষ তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। বৃথা লোকক্ষয় হইতেছে দেখিয়া ইংরাজ সেনাপতি সৈন্যদের হটিয়া আসিবার আদেশ দিলেন। বুয়রেরা প্রবল পরাক্রমে একটা কামানের গাড়ীর উপর পড়িল—ইংরাজ তরফ হইতে ৮জন সেখানা রক্ষা করিবার জন্য মৃত্যুমুখে ছুটিল। শত্রুর কবল হইতে কামানের গাড়ী রক্ষা হইল বটে কিন্তু তাহার মধ্যে পাঁচজন তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হইল, দুইজন সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া ৫ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল, অবশিষ্ট একজন সে আমাদের রবার্ট ম্যাকডোণাল্ড, সেও আহত হইল। শত্রুর গুলি তাহার পায়ে আসিয়া লাগিয়াছে।

বব্ এখন হাঁসপাতালে। ডাক্তার প্রথম ভয় পাইয়াছিলেন এবং আহত স্থানের অবস্থা দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে পা বুঝি কাটিয়া বাদ দিতে হইবে, কিন্তু তাহা হইল না। বব্ ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল।

উপরোক্ত যুদ্ধের বিবরণ এবং এই আটজন বীরের অসীম সাহস এবং অপূর্ব্ব রণকৌশলের কথা বিশ্বদূত রয়টার বিশদ্‌ভাবে পাঠাইলেন। মিস্ মারে প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজ পাঠ করেন। বড় বড় হরপে রবার্ট ম্যাকডোণাল্ডের নাম দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, বিশেষ মনযোগ দিয়া তিনি সমস্তখানি বার-বার পাঠ করিলেন। বব্ কি তবে দেশ ছাড়িয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় যুদ্ধে গিয়াছে? তাঁর প্রিয় ববের এই অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী পাঠ করিয়া, মিস্ মারে আনন্দ অনুভব করিলেন, কিন্তু বব্ যে গুরুতররূপে আহত হইয়াছে! যদি ইহাতেই তাহার

——তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না, ববের অমঙ্গল আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিলেন !

* * * *

দক্ষিণ আফ্রিকায় শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। লর্ড রবার্টসের একমাত্র পুত্র এই কাল সমরে প্রাণত্যাগ করার পরে ব্রিটানিয়ার বৃদ্ধ সেনাপতি স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিজয়লক্ষ্মী বীরবর লর্ড রবার্টসের কণ্ঠে বিজয়মালা পরাইলেন—বুয়রদের ইংলণ্ডের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইল।

এইবারে সকলের ফিরিবার পালা। হাঁসপাতালে ছয়মাস কাল থাকিয়া বব্ আজ সপ্তাহ খানেক ছাড়া পাইয়াছে। এখনও সে দুর্ব্বল। দুই একদিনের মধ্যে দেশে ফিরিতে পাইবে, এই আনন্দে এখন তার হৃদয় পূর্ণ।

সে আপনার মনে কত সুখের ছবি আঁকিতেছে। নিবিষ্ট মনে আরাম কেদারায় হেলান দিয়া সে কত কি ভাবিতেছে —বাড়ীর কথা, মিস্ মারের কথা! এমন সময়ে তাহার সেনাপতি তাহার নিকট আসিয়া হাজির—হঠাৎ এরূপভাবে তাঁহাকে দেখিবে এ কথাটা সে ভাবে নাই—যাহা হউক সৈন্যদিগের প্রথা অনুসারে সে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। সেনাপতি বলিলেন—"যুবক, তোমার সাহস ও রণকৌশলে আমি তোমার উপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। এরূপ বীরত্ব ও কৌশলের পুরস্কার হওয়া উচিত—তাই প্রধান সেনাপতিকে বলে যাতে তোমার পদোন্নতি হয় সেজন্য War Officeএ তোমার জন্য বিশেষ সুপারিশ করা হয়েছিল। আজ খবর এসেছে যে তোমার পদোন্নতি মঞ্জুর হয়েছে তুমি লেফটেনাণ্টের পদে উন্নীত

হয়েছ। যুবক, সৈনিক জীবনের আরম্ভেই তুমি যশোলাভ করেছ, আশা করি তোমার ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হবে।” এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কয়েকদিন পরে বব্ সৈনিকদলের সঙ্গে দেশে ফিরিল। আজ তাহার খুব আনন্দ—চিরপরিচিত প্রিয়জনের সঙ্গে আবার দেখা-শুনা হইবে! জাহাজে সেনাদল এবং অদূরে জনতা উচ্চকণ্ঠে গাহিতে লাগিল :—

Rule, rule, Britannia, rule the waves,
Britons shall never be the slaves.

ইংলণ্ডের উপকূলে যখন তাহাদের জাহাজ আসিয়া লাগিল, তখন আবার সেই বিপুল জনতার আনন্দ ধ্বনিতে দিগন্ত পূর্ণ হইল। যেদিন ইংলণ্ড ছাড়ে সেদিন সে একা ছিল, আজ যখন সে ফিরিয়া আসিল তখনও সে একা—তবে সেদিন সে শূন্যতা লইয়া বাহির হইয়াছিল আর আজ পরিপূর্ণ আনন্দে সে ফিরিয়া আসিয়াছে! করুণ বিদায় দুঃখের মধ্যে সেদিন সে বুঝিয়াছিল যে সংসার সুন্দর, আজ মিলনের আনন্দের ভিতরে সে আর একবার বুঝিল যে বাস্তবিকই সংসার সুন্দর!

দেশের মাটিতে যখন সে দাঁড়াইল তখন কি যেন কেমন একটা আনন্দ লাভ করিল, যেটা যুদ্ধক্ষেত্রের যশ কিম্বা গৌরব অপেক্ষা মহান্!

মিস্ মারে নিজের পাঠাগারে বসিয়া সন্ধ্যাবায়ু সেবন করিতেছেন —এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, সৈনিক বেশধারী তরুণ যুবক সেই ঘরে প্রবেশ করিল। “একি, এ যে বব্! বব্—

বব্—তুমি এসেছ, এ স্বপ্ন না সত্য! হঠাৎ কি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল।"

ছেলেবেলায় সে যেমন তাঁহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িত, আজ এই করুণাময়ী বৃদ্ধার বুকে সে তেমি ভাবে গিয়া পড়িল।

একে একে মিস্ মারে তাহাকে সব জিজ্ঞাসা করিলেন; সে সব কথার উত্তর দিল—এবং সর্ব্বশেষে তাহার বীরত্বের পুরস্কার লেপ্টেনাণ্ট পদে উন্নীত হইয়াছে, তাহাও তাঁহাকে বলিল। মিস্ মারে বলিলেন—"এতদিনে আমার আশার স্বপ্ন ফলিল।" ইহার পরে তিনি তাহার মস্তক চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বব্ বলিয়া উঠিল "আজ যে যশ অর্জ্জন করেছি, তাহা সম্পূর্ণভাবে আপনার জন্য। আপনার স্নেহ এবং ক্ষমা আমাকে মনুষ্যত্বের পথ দেখিয়ে দিয়েছে, ইহজীবনে আপনার ঋণ পরিশোধ করতে পারব না, সত্য বটে, কিন্তু আপনার স্নেহের জয় হয়েছে। আপনার প্রিয় বব্ মানুষ হয়েছে।" এই বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সে নিজেদের বাড়ীতে গেল।

হারানিধিকে ফিরিয়া পাইয়া তাহাদের ক্ষুদ্র গৃহ আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সাজা

জমীদারী কাছারীতে হাজির হইবার জন্য করিমুদ্দিনের উপর যখন তলব আসিল সে বেচারার অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল!

করিম জানিত এ ডাক স্বয়ং জমীদারের। নিতান্ত ঘাড়ে ভূত না চাপিলে "বাবুর" ডাক অগ্রাহ্য করা কাহারও সাহসে কুলায় না—কেননা ঘাড়ের সঙ্গে মুণ্ডুটার যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, হুকুমের অবাধ্য হইলে, সেটাকে যে কেমন করিয়া নষ্ট করিতে হয়, সে বিদ্যাটা তিনি খুব ভাল রকমই শিখিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র গ্রামের দুর্দ্দান্ত জমীদার জয়কালী চৌধুরীকে ভয় করিত না সে সময়ে সে অঞ্চলে এমন লোক ছিল না। পেটে তাঁর বিদ্যা ছিল না সত্য বটে, কিন্তু সে অভাবটা তিনি লাঠির বলে সারিতেন. এবং দুষ্ট বুদ্ধি জিনিসটা তাঁর টাক-পড়া মাথায় এত ভরাট ছিল যে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত খরচ করিয়া ও সেটার কোন কম্‌তি হয় নাই, বরঞ্চ লোকে মনে করিত যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ও জিনিসটা তাঁর বাড়িতেছিল। মিথ্যা মোকদ্দমা, জাল জুয়াচুরী, তাঁর লম্বা চৌড়া শরীরের যেন ডান হাত, বাঁ হাত। তিনি যখন চলেন—তাঁর প্রকাণ্ড ভূঁড়িটা আগে আগে শরীর রক্ষকের মতন চলে! ভূঁড়িটা শরীর-রক্ষকই বটে, কেননা পরের অনেক জিনিসই তিনি উহার মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করিতেছিলেন। তাঁর গায়ের রং মিশ্‌মিশে কালো, "যেমন কালি কালো, মিশি কালো, কিম্বা

অমাবস্যার নিশি কালো," কিন্তু সকলেই জানিত তার চেয়ে আরও কালো ছিল তাঁর মনটা। হাসি জিনিসটা তাঁহার মুখে বড় একটা দেখা যাইত না—কারণ হাসির বাজে খরচটাকে তিনি অন্যায় মনে করিতেন। যদি বা তাঁহার অধরে ভুলে কখনও হাসি ফুটিয়া উঠিত, তাহা হইলে তাঁহার দাঁতগুলি এমনি ভাবে বাহির হইয়া পড়িত বাস্তবিকই তখন মনে হইত যে প্রাণীবিশেষ শাঁকালু খাইতেছে। জাতিতে তিনি কায়স্থ কিন্তু আচরণে যা,—তাহা আর বলিয়া কাজ নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয় শুধু এইটুকু, এই ক্ষুদ্র গ্রামের প্রবল জমিদার যিনি অত্যাচার করিতে কোনদিনও কুণ্ঠিত হইতেন না তিনি কিন্তু 'জপ' না করিয়া আবার জলগ্রহণ করিতেন না! চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হরিনামের ঝুলি ও মালা হাতে করিয়া যখন তিনি জপে বসিতেন সেটা ঠিক মানানসই হইত না, মনে মনে সকলেই বেশ বুঝিত, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোনদিন কেউ একথা তাঁর সামনে বলিতে সাহস পায় নাই, কেননা মাথা বলিয়া জিনিসটাকে তাহা হইলে তাঁর জমিদারীতে বাস করিয়া বাঁচাইয়া চলা একটা প্রকাণ্ড দায়ের মধ্যে দাঁড়াইবে। সুতরাং আড়ালে যে যাহাই বলুক্ না কেন, তাঁর সম্মুখে এই ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রশংসা সকলেই করিত। গেরুয়া যেমন বৈরাগ্যের হজ্‌মীগুলি, আমাদের জমীদার বাবুরও এই আড়ম্বরপূর্ণ ধর্ম্মনিষ্ঠার অভিনয় ঠিক তেমনি হজ্‌মীগুলি।

একখানা ফর্সা কাপড় ভাঙ্গিয়া ও একটা আধময়লা ছেড়া পিরণের উপর কাঁধে চাদরখানা ঝুলাইয়া করিমুদ্দিন নবমীর পাঠার ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে জমীদারী কাছারীতে উপস্থিত হইল।

জমীদারের বাড়ীতেই কাছারী। ক্ষুদ্র গ্রামের মাঝখানে

চক-মিলান দ্বিতল বাড়ীখানা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া নিজের ক্ষমতা প্রচার করিতেছে!

করিমুদ্দিন ধীরে ধীরে কাছারী ঘরে প্রবেশ করিয়াই, মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া বাবুকে মস্ত সেলাম জানাইয়া এক কোণে গিয়া দাঁড়াইল। জমাদার তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। এটা নাকি তাঁর একটা জমিদারী চাল, কেননা তাঁর বিশ্বাস যে, পৃথিবীতে কতকগুলা লোক শুধু সেলাম করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আর কতকগুলা লোক শুধু সেলাম পাইবার জন্য আসিয়াছে। তাঁর ন্যায়-শাস্ত্রের এই আশ্চর্য্য দখলটা তিনি কারণে অকারণে মাঝে মাঝে কাছারী ঘরে বসিয়াই প্রচার করিতেন—সকলে নীরবে শুনিত মাত্র। তিনি বলিতেন যে, "এই ধরনা কেন, পাল্কির সৃষ্টি হয়েছে কি জন্যে—কতকগুলো লোক চড়বে, আর কতকগুলো লোক বইবে বলে। এই ধরনা কেন, সবাই যদি বলে পাল্কী চড়ব, তাহলে বইবে কে?" সকলে তখন বলিত "চমৎকার! কি চমৎকার ব্যাখ্যা, এই সেকাল হলে আমাদের বাবু একটা শাস্ত্র লিখে ফেলতেন।" প্রশংসা শুনিতে শুনিতে জয়কালী বাবুর ছাতি দশহাত ফুলিয়া উঠিত। আড়ালে সকলে এই কথাটা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়া বেশ আনন্দ অনুভব করিত।

ঘণ্টাখানেক দাঁড়াইবার পর জয়কালীর দৃষ্টি করিমুদ্দিনের উপর পড়িল—জমীদারের চাহনিতেই তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিল—"জমীদার না যমদূত!"

জমিদার ডাকিলেন—"করিম"। করিম সত্যই কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেলাম করিয়া কহিল "হুজুর, ধর্ম্মাবতার।"

জয়কালীর যেমন বিকট চেহারা, তাঁর গলার আওয়াজ ও আবার তেম্‌নি বিকট। ছেলেবেলায় তাঁর মা বোধহয় তাঁকে মধু খাওয়ান নাই, গলার সুর তাহা হইলে নিশ্চয় মধুমাখা হইত।

গ্রামের স্কুল পাঠশালা পলাইয়া একদিন এই বালক-জমীদার সকলকে ব্যস্ত করিত, কিন্তু তখন সেটায় কোন-ও "বিষ" ছিল না—চপলতা ছিল মাত্র। কিন্তু যে কোনোদিন শাসন মানিয়া চলে নাই, তার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এক একটা দোষ তাই তার ঘাড়ে ভূতের মতন চাপিয়া বসিল। একটু বড় হইলে সে নেশায় ওস্তাদ হইয়া উঠিল—অতিরিক্ত সিদ্ধি ও গাঁজা খাইয়া 'ভোঁ' হইয়া থাকিত। তখন হইতেই তাহার গলার স্বর কি এক রকম 'বেতর' বিকৃত হইয়া পড়িল—সে কথা কহিলেই মনে হইত যেন ফাটা নল-বাঁশে হাওয়া ঢুকিয়া শব্দ হইতেছে। আজ বার্দ্ধক্যের সীমায় আসিয়া সব ছাড়িয়া শুধু একমাত্র অহিফেনকেই তিনি সার করিয়াছেন। তাই করিম যখন উত্তর দিল, আফিমের মাত্রা চড়ান ছিল বলিয়া সেটা তাঁর কাণে পৌছায় নাই। তিনি বেশ ঝিমাইতেছিলেন। যখন একটু চমক ভাঙ্গিল তখন আবার ডাকিলেন—"করিম"। করিম পুনরায় সেলাম জানাইয়া উত্তর দিল—"হুজুর, ধর্ম্মাবতার।"

জয়কালীর আবার একটা মুদ্রা-দোষও ছিল, কাহারও সহিত কথা কহিতে গেলে "এই ধর না কেন" এই কথাটা তিনি বারবার বলিতেন।

জয়কালী বলিলেন "করিম, তোমার ব্যাপারখানা কি? এই ধরনা কেন, তুমি কি মনে করেছ যে বাকী খাজনা আর দিতে হবে না!"

সভয়ে করিম উত্তর করিল, "হুজুর, ধর্ম্মাবতার, আর দুটো মাস সবুর করুন, ধান কাটা হলেই, বকেয়া উশুল করে দেব।"

"তোমার ধান কাটার জন্যে সরকারকে যে আমার খাজনা দিতে হবে, এই ধরনা কেন, সেটা বাকী রাখ্‌তে চাইলে সরকার কি তা' শুনবেন ?" এই বলিয়া রাগে জয়কালীর গোল চক্ষু দুইটা ভঁাটার ন্যায় ঘুরিতে লাগিল।

করিম বেচারা ভয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল, অতি ধীরে ধীরে বলিল—"হুজুর আমার বড় বিপদ।"

তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া জয়কালী কহিলেন—"বিপদ আপদ এই ধর না কেন সবাইয়ের আছে, তার জন্যে কার কোন্ কাজটা আটকায়, করিম ? এই ধর না কেন, তোমরা বাকী খাজনা যদি ফেলে রাখ তাহলে জমীদারের বাড়ীতে রোজ একাদশী হবে যে ! আমিও ছাঁপোষা, সেটাওত, এই ধর না কেন, ভেবে দেখ্‌তে হয়। তাহলে করিম ঠিক করে বল, কবে দিয়ে যাবে ?"

জমীদারের দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, সে ধীরে ধীরে কহিল "কর্ত্তা, আপনি গরীবের মা-বাপ, আপনি যদি এ বিপদে না রাখেন, তাহলে ধনে প্রাণে মারা যাব। হুজুর, আমার বড় বিপদ আমার ছোটমেয়ে দু মাসের ওপর হল ব্যারামে ভুগ্‌ছে। অষুধ পথ্যিতে গরীবের যা কিছু ছিল সব গেছে। আর দুটো মাস সময় দিন ধর্ম্মাবতার, যেমন করে হোক্ খাজনার টাকা আমি চুকিয়ে দিয়ে যাব।"

জয়কালী কহিলেন—"করিম, এখনই বরং যেমন করে পার টাকার যোগাড় দেখগে, এই ধরনা কেন, এখন যা পাচ্ছ না, ছ মাস পরে যে সেটা নিশ্চয় পার্ব্বে, তারই বা ভরসা কি ? আর

ধরনা কেন, একটা কথা কি জান, সমুখে পূজাও এসে পড়ছে আমারও কিস্তিবন্দীর টাকার দরকার, এসময়ে রেহাই দেওয়াটা আমার পক্ষে অসম্ভব।”

কাঁদ কাঁদ স্বরে করিম বলিল, “তবে হুজুর উপায়!”

দৃঢ়স্বরে জয়কালী কহিলেন “উপায় ত অতি সহজ পড়ে রয়েছে করিম, ছ মাস পরে যেটা অনায়াসে দিতে পার্ব্বে মনে কচ্ছ, এই ধরনা কেন, সেটা এখন একটু চেষ্টা কল্লেই দিতে পার, এই ধরনা কেন, কেন এখন যে দিতে পার্বে না আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনে। এ সমস্ত তোমাদের শুধু বজ্জাতি বইত নয়। ঘোর কলি কিনা, ভাল মানুষের কাল নেই।”

করিম ভয়ে ভয়ে কহিল—“মেরে ফেল্‌লেও কর্ত্তা আমার এখন দেবার উপায় নেই।”

উত্তর শুনিয়া জয়কালী শুধু একটা সংক্ষিপ্ত “হুঁ” শব্দ করিলেন এবং আপনার মনে একটু হাসিলেন। সে হাসি দেখিয়া গরীব করিমুদ্দিন শিহরিয়া উঠিল! এ হাসির অর্থ সে যে বিলক্ষণ জানে!

জমীদারী কাছারি হইতে বিদায় লইয়া, করিম যখন রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তার মন দুর্ভাবনায় পূর্ণ। এখন তাহার বয়স ৪০ এর উপর। দরিদ্র হইলেও এতদিন সে জান্ মান বাঁচাইয়া চলিয়া আসিয়াছে কিন্তু এইবার বুঝি ভরা-ডুবি হয়! সে কি করিবে কোনও উপায় ত খুজিয়া পাইতেছে না—তার রুগ্নকন্যার শুষ্ক মুখখানি মনে পড়িল! সহজ অবস্থায় ছোট-ছোট হাত দুখানি বাড়াইয়া দিয়া আধ-আধ ভাষায় সে যখন তার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িত, কি আনন্দে না তার হৃদয় পূর্ণ হইত!

আর এখন!—সে হাসে না, খেলা ও করে না। কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার কোনও চেষ্টা করে না। আজ রোগেতে তাহার মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে, সে কেমন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে —হইবারইত কথা, দুই মাসের উপর ভুগিতেছে। মেয়ের এই অবস্থা—না জানি জমীদার ইহার উপর কি করিবেন! সে চারিদিক অন্ধকার দেখিল। চলিতে চলিতে উর্দ্ধে তাকাইয়া একবার বলিয়া উঠিল "হা, আল্লা!" সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল। তাহার উচ্চারিত বাক্য ও নিশ্বাস উর্দ্ধে, অসীম শূন্যে মিশিয়া গেল! দরিদ্রের মর্ম্মবেদনা দেবতার কানে পৌঁছিল কিনা কে জানে?

ইহার কিছুদিন পরে মিথ্যা দেনার খতে ও বাকী খাজনার দায়ে করিমুদ্দিনের যাহা কিছু ছিল, মায় বাস্তুভিটাখানা পর্য্যন্ত নিলামে চড়িল। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিজের সর্ব্বনাশ দেখিল, রুখিবার কোনও উপায় নাই! প্রবল জমীদারের অত্যাচারে আজ দুর্ব্বল দরিদ্র সর্ব্বস্বান্ত হইল! চোখ ফাটিয়া তাহার জল পড়িল। একি বিপদ! দুই দিন পূর্ব্বে তাহার মেয়েটি ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে. এখনও শোকের যন্ত্রণায় তাহার স্ত্রী অধীরা। এ আবার কি সর্ব্বনাশ! সে শূন্য প্রাণে উদাস দৃষ্টিতে একবার শূন্য আকাশের দিকে তাকাইল! ঐ—ঐখানে, না, তার কন্যা রোগের হাত এড়াইয়া শান্তিলাভ করিতেছে, সে আর কতদিন যন্ত্রণা ভোগ করিবে! যখন স্ত্রী ও ছেলে দুটীর হাত ধরিয়া তাহাকে পথে দাঁড়াইতে হইল, তখন তার ঠিক বোধ হইতে লাগিল পায়ের তলায় মাটি সরিয়া যাইতেছে। আজ এত বড় পৃথিবীতে তার এতটুকুও দাঁড়াইবার স্থান রহিল না!

এইরূপ নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িয়া করিম যখন নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল—সে এখন কি করিবে, কোথায় যাইবে,—ঠিক সেই সময়ে একজন প্রতিবেশী মুসলমান আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিল। সেও দরিদ্র, করিমও দরিদ্র—দরিদ্র না হইলে দরিদ্রের মর্ম্মব্যথা কে বুঝিবে!

পাঁচ সাত ক্রোশ দূরে গ্রামান্তরে করিমের ভগ্নীপতির বাস। সে তার নিকট এই সর্ব্বনাশের সংবাদ পাঠাইয়াছে। দুই দিন পরে তার ভগ্নীপতি আসিল—দুজনে সুখ দুঃখের কত কথা কহিল। তার ভগ্নীপতি কিছুতেই ছাড়িল না; বলিলঃ—"চল, করিম আমার ওখানে চল; এখানে ত আর তোমার থাকা হ'তে পারে না। করিম, তুমি ভাল লোক তোমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, কিন্তু ভয় কি ভাই, দিন-দুনিয়ার মালিক খোদা—তিনিই ত দেনেওয়ালা, কে বল্‌তে পারে যে তিনি তোমায় আবার ছপ্পর ভরে দেবেন না?" ভগ্নীপতির কথা তার মর্ম্ম স্পর্শ করিল। করিমের চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া উঠিল।

যাওয়াই স্থির হইল। গ্রাম ত্যাগ করিবার সময় তাহার বুক ফাটিয়া গেল। পাঁচ পুরুষ ধরিয়া যেখানে বসবাস সেস্থান যে বড় প্রিয়! ৪০ বৎসর ধরিয়া সে-ও না এই ক্ষুদ্র গ্রামের কোলে স্থান পাইয়া আসিতেছে! দীর্ঘজীবনের সুখ দুঃখের স্মৃতি উহারই সঙ্গে না জড়িত! পরিচিত পথ, ঘাট, বৃক্ষ, কুটীর, সে যতবারই দেখে, তার প্রাণ কেমন করিয়া উঠে! তবু তাহাকে গ্রাম ত্যাগ করিতে হইল!

* * * *

উপরোক্ত ঘটনার পর পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। করিম বুড়া হইয়া আসিতেছে বটে কিন্তু এখনও তাহার দেহ বেশ মজবুৎ।

তাহার দুই পুত্র জোয়ান হইয়া উঠিয়াছে। করিম এখন আর চাষ-বাস করে না। প্রথমে সে বড়ই কষ্টে পড়িয়াছিল। তাহার ভগ্নীপতি তাহাকে রক্ষা করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছে। পরিশ্রমের ফলে, অদৃষ্ট এখন সুপ্রসন্ন।

গ্রামের পাশ দিয়াই গঙ্গা প্রবাহিতা। জেলে ডিঙ্গি করিয়া করিম ও তার দুই ছেলে নদীতে নিত্য মাছ ধরে। মাছের ব্যবসায় তার আবার দুই পয়সার সংস্থান হইয়াছে। সে নিজে খুব পরিশ্রমী—ছেলে দুটীও পরিশ্রমী। এই গ্রামে আসার পর করিমের ঘরে আবার একটী মেয়ে হইয়াছে।

জ্যৈষ্ঠ মাস। অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে—বাতাস চলিতেছে না। করিম তার ছেলেদের লইয়া গঙ্গাবক্ষে মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে। বেলা পড়িয়া আসিল—আকাশে এক খণ্ড মেঘ দেখা গেল, ক্ষুদ্র কালো মেঘ দেখিতে দেখিতে বড় হইল। করিম বুঝিল এই মেঘে ভীষণ ঝড় উঠিবে। ঝড় উঠিলে আর মাছ ধরা চলিবে না, তাই সে নৌকা ঘাটের দিকে ভিড়াইতে লাগিল।

এমন সময়ে অদূরে দেখা গেল ৪।৫ খানা নৌকা, তীর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। নৌকা কয়েকখানা প্রায় ঘাটের কাছে আসিয়াছে, সেই সময়ে প্রবল ঝড় উঠিল। গেল-গেল রবে নৌকার যাত্রীরা চীৎকার করিয়া উঠিল। নিমেষের মধ্যে একখানা নৌকা সত্য সত্যই কাৎ হইল। তীরে দাঁড়াইয়া করিম ও তার পুত্রদ্বয় সব দেখিল—প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া তখনই তারা তিনজনে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অতি কষ্টে তিনজনে মিলিয়া দুই জনকে উঠাইল। মাঝি মাল্লারা সব রক্ষা পাইয়াছে। অন্য চার খানা নৌকার যাত্রীরাও ততক্ষণে তীরে উঠিয়াছে।

যখন দেখা গেল যে শুধু দুই জনকে জল হইতে উঠান হইয়াছে, তখন ভারী গোল পড়িয়া গেল—কারণ কর্ত্তার ছোট ছেলে ঐ নৌকায় ছিল, তাকে পাওয়া যায় নাই! করিমের কাণে কথাটা গেল সে আবার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে তার পুত্রদ্বয়ও ঝাঁপ দিল। তিন জনে মিলিয়া অনেক খুঁজিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—কর্ত্তার ছোট ছেলেকে পাওয়া গেল না!

তখন সবে সন্ধ্যা নামিতেছে। প্রকৃতি যেন মাতিয়া উঠিয়াছেন। যেমন বৃষ্টি তেম্‌নি তার সঙ্গে প্রবল বাতাস। যে দুজনকে উঠান হইয়াছে, তার মধ্যে একজন বৃদ্ধ আর একজন বালিকা। দুজনই অজ্ঞান—জ্ঞান সম্পাদনের অনেক চেষ্টা করা হইতেছে, বৃদ্ধের যেন চেতনা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছে কিন্তু বালিকা নিশ্চল। করিম ও তার ছেলে দুইটী একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিল। করিম যখন দেখিল গোলমাল কিছুতেই থামিতেছে না, সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। ঠিক এই সময়ে বিদ্যুৎ চমকাইল, চকিতের মধ্যে সে যাহা দেখিল তাহাতে চমকাইয়া উঠিল। অজ্ঞানাবস্থায় শায়িত মূর্ত্তি তাহার খুব চেনা যে!—সে মূর্ত্তি জমীদার জয়কালী চৌধুরীর!

ক্রমে মেঘ কাটিয়া গেল, বাতাসের বেগ থামিয়া আসিল; প্রকৃতি আবার শান্তমূর্ত্তি ধরিলেন। গ্রাম হইতে করিমের ছেলেরা লণ্ঠন আনিয়াছে। বৈদ্য ও আসিয়াছেন; কর্ত্তা এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন, তবুও বৈদ্য তাঁহাকে বলকারক একটা ঔষধ দিলেন। বালিকার কিন্তু এখনও জ্ঞান হয় নাই—বৈদ্য তাহাকে দেখিয়া মুখ গম্ভীর করিলেন, আবার খুব ভাল করিয়া দেখিলেন

এবং শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন বালিকার মৃত্যু ঘটিয়াছে। কি ভয়ানক কথা!

জয়কালী চৌধুরী গ্রামান্তরে ছোট ছেলের বিবাহ দিতে গিয়াছিলেন। গৃহিণী এবং দুই পুত্রবধূ বাড়ীতে আছেন। সঙ্গে ছিল তাঁর অন্য দুই ছেলে এবং বরযাত্রীরা। বিবাহ দিয়া যখন ফিরিতেছিলেন তখন নৌকা-ডুবি হয়। তার ফলে ছোট ছেলেকে হারাইলেন, আর নববিবাহিতা বধূ, তাহাকে পাওয়া গিয়াছে কিন্তু জীবিত অবস্থায় নহে!

গভীর রাত্রি; চারিদিক নিস্তব্ধ। ধূ-ধূ করিয়া চিতার আগুন জ্বলিতেছে! কোথায় নব-বধূর ফুলশয্যা হইবে, না কোথায় তার চিতাশয্যা! দূরে দাঁড়াইয়া জয়কালী সবই দেখিলেন। সেই যন্ত্রণায় আজ তাঁর হৃদয় পূর্ণ, যে-যন্ত্রণায় চোখের জল পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায়।

জয়কালী চৌধুরী যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, ধীরে ধীরে করিম সেদিকে অগ্রসর হইল। জয়কালী প্রথমে তাহাকে দেখেন নাই। কিছুক্ষণ পরে তাঁর দৃষ্টি তার উপর পড়িল। দেখিবামাত্রই তিনি চিনিতে পারিলেন। তাঁর একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়িল। তিনি ডাকিলেন—"করিম!" করিম উত্তর দিল—"কর্ত্তা।"

কাতর-কণ্ঠে জয়কালী কহিলেন—"আমার কি হ'ল, করিম।" করিম কহিল—"কর্ত্তা, নসীব।"

এতক্ষণ পরে জয়কালী করিমের নিকট নৌকাডুবির সমস্ত ঘটনা শুনিলেন।

"তা' হলে, করিম, তুমিই আমার প্রাণরক্ষা করেছ।"

"না, হুজুর খোদা আপনাকে দয়া করেছেন।"

"ঠিক বলেছ, করিম, খোদা আমাকে বাঁচিয়েছেন, সাজা দেবার জন্যে। তোমাকে সাক্ষী রেখে তিনি আমায় সাজা দিলেন। তা, হবে না? কত লোক আমার অত্যাচারে পথে পথে ফিরে বেড়াচ্ছে। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কতলোক আমায় অভিশাপ দিচ্ছে। এত লোককে কষ্ট দিয়েছি, তা কি মিথ্যা যাবে? তা হয় না করিম, তা হয় না, তাই খোদা আজ আমার বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন—এ আগুণের জ্বালা বেঁচে থাকতে নিভবে না! ভগবানের সাজা বড় ভয়ানক, করিম—বড় ভয়ানক।"

করিম চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সব শুনিল। কর্ত্তা যে তার এত সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তবু তাঁর জন্য সে বেদনা অনুভব করিল!

প্রত্যূষে জয়কালী গৃহে ফিরিলেন, গৃহিণী সমস্ত ঘটনা শুনিয়া ভূমিতে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সর্ব্বনাশও লোকের হয়!

কোথায় পুত্রের বিবাহের আনন্দ—আর কোথায় শোকের মর্ম্মভেদী হাহাকার! বিবাহের সমস্ত উৎসব একটা দুর্ঘটনায় বিলুপ্ত হইয়া গেল! ভীষণ ক্রন্দন-রোলে জমীদার-ভবন কাঁপিয়া উঠিল!

কল্যাণকুমার

কোষ্ঠীর ফল কমলার ভাগ্যে ফলিল না—তিনি বিধবা হইলেন। ছেলেবেলায় তাঁর বাপ মা যখন গণকঠাকুরদের দিয়া হাতখানা দেখাইতেন, তখন সকলেই একবাক্যে বলিত "আহা মেয়ে যেন লক্ষ্মী ঠাকরুণ, খুব ভাগ্যবতী হবে, কখনও বিধবা হবে না।" কিন্তু হাতে যাহা লেখা ছিল না কপালে তাহা লেখা ছিল!

বিধবা অনেকেই হয়, কিন্তু এমন ভাবে কয়জন হয়? মরণের জন্য প্রস্তুত থাকিলে মৃত্যুর বেদনা অসহ্য হয় না, কিন্তু সুস্থ শরীরে প্রাণটা যদি হঠাৎ উপিয়া যায়, আত্মীয় স্বজন যাঁরা বাঁচিয়া থাকেন, তাঁদের পক্ষে তেমনতর হঠাৎ মৃত্যুর ভীষণ ধাক্কাটা সামলান নিতান্ত কষ্টকর হইয়া পড়ে। কোন রোগ নাই, কোন অসুখ নাই, আহারান্তে রাত্রে স্বামী শয়ন করিলেন, আর তাঁর ঘুম ভাঙ্গিল না!—সকলে জাগিল কমলার স্বামী শুধু আর জাগিলেন না! সেদিনকার প্রভাত কি নিষ্ঠুর! স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিল না, তবে কমলার ঘুম ভাঙ্গিল কেন?

পূর্ণ দম থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় ঘড়ি বন্ধ হইয়া যায়; বাতাস বেগে না বহিলেও এবং তৈল সলিতার অভাব না থাকিলেও প্রদীপ কখনও কখনও নিভিয়া যায়! ঠিক দেহ সম্বন্ধেও সচরাচর না হউক, ঐরূপ ঘটে কমলার স্বামী তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

সচরাচর মৃত্যু সাড়া দিয়া আসে কিন্তু সৌভাগ্যবতীর

সৌভাগ্যকে চূর্ণ করিবার জন্য, মৃত্যু নিঃশব্দেই আসিয়াছিল। এমনিভাবে এত বড় সর্ব্বনাশ হইবে কমলা কোনোদিনও ভাবেন নাই কিন্তু যাহা হয় তাহা ত আমরা অনেক সময় ভাবি না কিম্বা যাহা ভাবি তাহা অনেক সময় হয় না। সে যাহা হউক, কমলা না ভাবিলেও তিনি বিধবা হইলেন।

সুখের দিনের কথা কমলার যতই মনে পড়ে, শোকের বেদনায় তিনি ততই আকুল হইয়া পড়েন। আহা, আজ যদি তাঁর পিতামাতা বাঁচিয়া থাকিতেন, তা'হলে তিনি একবার মায়ের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বেদনা কতকটা ভুলিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন—কিন্তু তাঁরাও যে অনেকদিন মায়া কাটাইয়াছেন!

কমলার পিতৃগৃহ কলিকাতা, কিন্তু সেখানে তাঁদের নিজের ভিটা নাই। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ছিল বলিয়া তাঁর পিতা যাহা রোজগার করিতেন, তাহা প্রায় সব খরচ হইয়া যাইত,—সুতরাং কলিকাতায় বাসা বাড়ীতেই তাঁদের জীবন কাটিয়াছে। কমলার পিতা মেয়েদের বেশ ভাল ঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন। তিন পুত্র চাকরী করে। তারা স্ত্রীপুত্র লইয়া বিদেশে বস-বাস করিয়া প্রবাসী হইয়াছে। কলিকাতার বাস উঠিয়াছে। ভাইয়েরা কমলার খুব না হোক্, খোঁজ খবর রাখেন; কার্য্যগতিকেই হউক, অথবা বেড়াইবার জন্য হউক, কলিকাতায় আসিলেই তাঁরা কমলাকে দেখিয়া যান।

সে আজ অনেক দিনের কথা, কমলা যখন পিতৃভবন হইতে বিদায় লইয়া আসে, তখন তার মোটে বারো বৎসর বয়স। বাপের বাড়ী ছাড়িয়া আসিতে সকলেরই কষ্ট হয়, সুতরাং তারও যে কষ্ট হইয়াছিল, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। আহা, বেচারা

সমস্ত পথটা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়াছিল। চিরপরিচিত পরিজনেরা যখন বালিকা বধূকে ঘিরিয়া দাঁড়ায় এবং বিদায়ের সময় যতই নিকট হইতে থাকে, তখন তার ক্ষুদ্র কোমল প্রাণটা এই পরিচিত বন্ধনকে আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য কত না চেষ্টা করে, সে চেষ্টা সফল হয় না—কাজেই সকলের নিকট বিদায় লইয়া কমলাকেও কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুর ঘর করিবার জন্য যাইতে হইল!

প্রথম যখন মেয়ে শ্বশুর ঘর করিতে যায়, তখন তার সঙ্গে বাড়ীর পুরাণো ঝি গিয়া থাকে, কেননা নব-বধূর যাহা কিছু দরকার সে বেচারা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, বাড়ীর পুরাণো ঝি যে তাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সে তাহার তদ্বির করিতে জানে এবং সমস্ত নূতনের মধ্যে একজন পুরাতনকে পাইলেও বালিকার প্রাণ কতকটা সুস্থ থাকিবে! কমলার ভাগ্যে তাহাও জুটিল না—কেননা কলিকাতায় যে-সব ঠিকা ঝি! ঠিকা ঝির ত ভারি দরদ। তাই বাপ মা অনেক বিবেচনা করিয়া কমলার ছোট ভাইটিকে তার সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। প্রথমে তার উৎসাহ দেখে কে—কিন্তু একদিন পল্লীগ্রামে থাকিয়াই সে বেচারা হাড়ে চটিয়া গেল। পরদিন সকালেই সে কান্না জুড়িয়া দিল। কমলার শ্বশুর বেগতিক দেখিয়া তাকে লোক সঙ্গে দিয়া পরদিন কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন।

হুগলী জেলার কোনো গ্রামে কমলার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁর স্বামীর তখন পঠদ্দশা। তাঁদের অবস্থা মন্দ নহে—চাকরী না করিলে চলে। জোত জমা কিছু আছে। ছেলেটি খুব ভাল লেখাপড়ায় বেশ মন, যখন বিবাহ হয় তখন তিনি বি, এ,

পড়িতেছিলেন। এম, এ, পাশ দেওয়া তাঁর ইচ্ছা। তারপরে তিনি ঠিক করিবেন, কি করিবেন!

বিবাহের পর, যখন কমলা শ্বশুরবাড়ী শুভ-যাত্রা করিয়াছিলেন, সে-ই একদিন আর আজ এই একদিন! সহরে একরকম ছিলেন, আর পল্লীগ্রামে আসিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে দুইটা জিনিসে বিস্তর প্রভেদ। তাঁকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামটী যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অন্দরে যখন প্রবেশ করিলেন, তখন কৌতূহলী দৃষ্টি তাঁকে এমন করিয়া দেখিতেছিল যে ভয়ে বালিকা জড়সড় হইয়া পড়িতেছিল। সেখানে মেয়েমহল তাঁকে যেন পাইয়া বসিল! "হাঁ, ভাই তোমার নাম কি?" "তুমি কি আগে পাড়াগাঁ দেখেছ?" উত্তরের কেহ প্রতীক্ষা করে না—শুধু প্রশ্নের উপর প্রশ্ন বর্ষণ হইতে লাগিল।

তারপর তাঁর রূপের সমালোচনা চলিতে লাগিল। কেহ বা বলিলেন "আহা, দিব্যি মেয়েটি—দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায়, মা যেন আমার ঘর আলো করে বসেচেন।" যাঁর শরীরে একটু হিংসা আছে, এত প্রশংসা তাঁর সইবে কেন, তিনি অম্‌নি চট্‌ করিয়া সেইখানেই বলিলেন—"হাঁ, সুন্দর, কিন্তু যতটা শুনেছিলাম, ততটা কই? আমাদের বিন্দি যদি কল্‌কেতায় থাক্‌ত ত ঐ রকম সুন্দর হতে পার্‌ত।" আর একজন এ-ফড়ফড়ানি সহিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আচ্ছা, না হয় বাপু, রংটাই হ'ত, কিন্তু অমন নাক চোকত আর জল হাওয়ায় গড়ত না।" এইরূপ নানারকম বাক্‌বিতণ্ডা ক্রমে ঝাঁঝাইয়া কলহে পরিণত হয় দেখিয়া বাড়ীর গৃহিনী মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন—"তোমাদের বাপু, অত শতয় কাজ কি—আমরা যাকে দেখে শুনে ঘরে এনেছি

সেত তোমাদের ঘর করতে যাবে না। সুন্দর হয় আমাদেরই থাক্‌বে, না সুন্দর হয় তোমাদের কি?" একজন স্পষ্টবক্তা বলিলেন —"কি জান, বড় বৌ, অসইরন সইতে নারি, এমন রূপ দেখে যার চোখ টাটায়, সে চোখের মাথা খায় না কেন?" এখন এই কথায় আবার ঝগড়া বাধবাধ হয় দেখিয়া গৃহিণী অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া সকলকে আবার থামান। গৃহিণীকে সকলে শ্রদ্ধা করিত—কেননা আপদে বিপদে তিনি 'দশখানা' হইয়া সকলের উপকার করিতেন।

নিন্দুকের দল কিন্তু ইহাতে হঠিল না—তাদের জোর সমালোচনা অপ্রতিহত বেগে চলিতে লাগিল। কেহ বলিল—"আচ্ছা রূপ না হয় আছে কিন্তু রূপ নিয়ে ত ধুয়ে খাবিনে, সহরে বাবু মেয়ে ঘরে এনেছিস্, দেখা যাবে কারদানী। ও-কি পুকুর থেকে জল তুলে আন্‌বে, না, ঘর দোর পাট করবে, না, গরুকে জাব দেবে, না ধান সিদ্ধ কর্‌বে? বয়ে গেছে, ও পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাক্‌বে—আর মরবে ঐ বুড়ী শাশুড়ী মাগীটা খেটে খেটে। ও, কেদারায় বসে কেতাব পড়বে। জল ঘাঁটলে সর্দ্দি হবে, হাওয়া লাগলে গলায় ব্যথা হবে, কথায় কথায় মূর্চ্ছো যাবে। ওকে আলমারীতে তুলে রাখ্‌তে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।"

কমলা যখন প্রমাণ করিল যে অবস্থার ফেরে পড়িলে মানুষে সব করিতে পারে, তখন নিন্দুকের দল একটু হতাশ হইলেন। কমলার এই সকল অনভ্যস্ত কাজ করিতে প্রথমটা একটু কষ্ট হইত, কিন্তু তার শাশুড়ীর শিক্ষার গুণে এবং তার নিজের প্রবল ইচ্ছার জোরে এ-সমস্ত কাজকর্ম্ম সে ক্রমে বেশ দখলে আনিল —এবং প্রমাণ করিয়া দিল যে, কলিকাতার মেয়ে একটা স্বতন্ত্র জীব

নহে কিম্বা একটা বিভীষিকার বস্তু নহে, বাঙ্গালা দেশের যে কোনো তুচ্ছ গ্রাম তাকে যদি নিজের স্নেহের কোলে টানিয়া লয়, তবে তার হৃদয়ে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা আছে, যার দ্বারা সে সকলকে বুঝাইয়া দিতে পারে সে তাদেরই একজন—পর নয়। কমলা যখন গুছাইয়া সংসার করিতে লাগিল, তখন তার কার্য্যের সুখ্যাতি আপনি প্রচার হইল। তার অমায়িক ব্যবহারে সকলে বাস্তবিকই মুগ্ধ হইত। সকলেই তখন বলিতে লাগিল—"আহা এমন মেয়ে আজকালকার দিনে দেখা যায় না।" শুধু বিশ্বনিন্দুকের দলের নিকটে তাহার এই "ন্যাকাপনা" সহ্য হইল না—তাঁদের মুখর রসনার নিকট বিশ্বদেবতা হইতে পেঁচোর মা'র পর্য্যন্ত কাহারও যে পরিত্রাণ নাই! ভাল দেখার শক্তি, ভাল না দেখিয়া দেখিয়া তাঁদের নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এম্, এ, পাশ দেওয়ার অল্পদিন পরেই কমলার স্বামীর পিতৃবিয়োগ হয়—সুতরাং দেশে তাঁহাকে থাকিতে হইল। মায়ের একান্তইচ্ছা বিদেশে গিয়া কাজ নাই, বিষয় সম্পত্তি তা'হলে "তছ্‌নছ্‌" হবে।

তিনি দেশে থাকিলেন। গ্রামে একটা স্কুল স্থাপন করিলেন। হোমিওপ্যাথিক পড়িয়া নিজে গ্রামবাসীদের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। গ্রামের উন্নতি অল্পে অল্পে হইতে লাগিল। নিজেও লেখাপড়ার চর্চ্চা রাখিতেন। মাসিক পত্রাদিতে গ্রাম সম্বন্ধে নানাকথা লিখিতেন।

সংসার বেশ সুখে কাটিতে লাগিল। তাঁদের এক পুত্র এক কন্যা। পুত্র বড়—নাম কল্যাণকুমার; কন্যা ছোট নাম—কল্যাণী। স্বামী স্ত্রীতে পুত্র কন্যাকে কিরূপ শিক্ষা দিতে হইবে তাহার প্ল্যান চলিত। এমন সময়ে কমলার কপাল ভাঙ্গিল।

অসহ্য পুত্রশোক সহ্য করিতে না পারিয়া কমলার শ্বাশুড়ীও মৃত্যুমুখে পতিতা হইলেন।

কল্যাণকুমার গ্রামের স্কুলে পড়াশুনা করিতেছে। কল্যাণীর বয়স সবে তিন বৎসর, তার দাদার বয়স আট।

সময় কাহারও মুখের দিকে তাকায় না—দেখিতে দেখিতে ৪ বৎসর কাটিয়া গেল। কল্যাণকুমার গ্রামের স্কুল হইতে মাইনার পরীক্ষা পাশ করিয়াছে এবং হুগলি জেলার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। সে বৃত্তি পাইয়াছে। গ্রামের লেখাপড়া তার শেষ হইল। কমলার এইবার ভাবনায় প্রাণ অস্থির হইল। দ্বাদশ বর্ষীয় বালক, তাহাকে কোথায় পাঠাইবেন—কে তাহার তত্ত্বাবধান করিবে, কে তাহাকে চোখে চোখে রাখিবে? লেখা পড়া ত বন্ধ দেওয়া চলে না! হুগলীতে জেলাস্কুল আছে—কিন্তু কলিকাতাতে অনেক ভাল ভাল স্কুল আছে।

সুবোধকুমার কমলার দূরসম্পর্কীয় দেবর। কলিকাতায় লেখাপড়া করিতেছে—বি, এ, পড়ে। সে আসিয়া বলিল—"বৌদি, কল্যাণের জন্য আপনি কেন ভাব্ছেন, আমার সঙ্গে তাকে পাঠিয়ে দিন; আমার কাছে তাকে রাখ্ব; আমি তার পড়া-শুনা সব দেখ্ব আপনার কোন চিন্তা নাই!" কমলা তার কথা শুনে অনেকটা আশ্বস্ত হলেন—গ্রামের মধ্যে সুবোধ খুব ভাল ছেলে, সকলেই জানে। তবে কিনা কলিকাতা বড় ভয়ানক সহর—যদি সেখানে দুঃখিনী বিধবার ভবিষ্যতের আশা-ভরসা এমন সোনার চাঁদ ছেলে বিগড়াইয়া যায়! কি করিবেন কোনো উপায়ান্তর না দেখিয়া কমলা শেষে রাজি হইলেন। সুবোধকে বলিলেন—"দেখ, ঠাকুরপো, কল্‌কাতা কি রকম তা'ত

তোমার জানতে বাকি নেই। আমার দুধের বাছা যেন সঙ্গদোষে নষ্ট হয়ে না যায়।" সুবোধ ও উত্তরে বলিল—"বৌদি, আমি থাকতে তা হবে না।" দেবরের এই আশ্বাস বাক্যে কমলা প্রীত হইলেন। তার স্বরের মধ্যে বেশ একটা দৃঢ়তা ছিল—যেটার উপরে তিনি স্বচ্ছন্দে নির্ভর করিলেন।

তিথি নক্ষত্র দেখিয়া শুভদিনে কল্যাণকুমার সুবোধকুমারের সহিত যাত্রা করিল। সুবোধ কল্যাণকে প্রথমে কলিকাতায় আনিয়াই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন না। দিন কয়েক ধরিয়া তিনি তাহাকে লইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন—যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেন, ইডেন গার্ডেন, পরেশনাথের মন্দির, লাটসাহেবের বাড়ী, জেনারেল পোষ্টাফিস, রাইটার্স বিল্ডিং প্রভৃতি দেখাইয়া আনিলেন। এই সব দেখাইতে ৮।১০ দিন কাটিয়া গেল। তারপরে সুবোধকুমার কল্যাণকুমারকে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

অন্যে হাজার আদর যত্ন করুক, মায়ের কাছ-ছাড়া হইয়া কল্যাণকুমার প্রথমে বেশ দমিয়া গেল—তার মায়ের জন্য মন কেমন করে, সে লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদে। আবার মাকে কবে দেখিবে? পিতৃহীন বালক মায়ের কাছ-ছাড়া কখনও হয় নাই। কল্যাণীর জন্যও তার ভারি মন কেমন করে।

কল্যাণকুমার মা ও কল্যাণীকে রোজ চিঠি লিখিত। সে কি করে কখন্ খায়, কখন্ ঘুমায়, সুবোধ কাকা কি কি করিতে বলেন—এই সব একই কথা সে রোজ-রোজ লিখিত। দিনের বেলা একরকম কাটিয়া যাইত, কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে তার মা ও কল্যাণীর জন্য প্রাণটা ছট্‌ফট্ করিত। মা এখন কি

করিতেছেন—কল্যাণী এখন কি করিতেছে; আচ্ছা আমি যত ওদের কথা ভাবি—ওরা কি আমার কথা তত ভাবে—এই রকম ভাবিতে ভাবিতে অনেক সময় সে ঘুমাইয়া পড়িত। সুবোধকুমার খাইবার সময় তাহাকে ডাকিয়া তুলিতেন।

সুবোধ ও কল্যাণ মেসে থাকে। যতই দিন যাইতে লাগিল, কল্যাণের কলিকাতা একরকম সহিয়া আসিল—মা ও কল্যাণীর জন্য তার মন কেমন করে কিন্তু আগেকার মতন অত নয়। সহ্য হইত না শুধু তাহার একটা জিনিস—সেটা হইতেছে মেসের খাওয়া। সে যে বরাবর মায়ের হাতের রান্না খাইয়া আসিয়াছে, ঝুঁটিবাঁধা উড়ে বামুনের বিচিত্র রান্না সে ঔষধের ন্যায় কোন রকমে গিলিত। তার খাওয়ার কষ্ট হইবে বলিয়া আসিবার সময় তার মাতা একটা বোতলে পুরিয়া সরতোলা ঘি সঙ্গে দিয়াছেন। সুবোধও অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া ভাল দুধের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে। সুবোধ তার জন্য যথাসাধ্য করে।

কলিকাতায় আসিয়া কল্যাণকুমার প্রথমে একটু ধাঁধায় পড়িয়া গেল। লোকের ভিড়, গাড়ীঘোড়ার চলাফেরার মধ্যে সেখানে যে ব্যস্ততা দেখা যায়, পল্লীগ্রামে তার কোনো চিহ্নই নাই, সুতরাং গ্রাম হইতে যে কখনও সহরে আসে নাই, বিচিত্র কলিকাতা সহরের সমস্ত দৃশ্যই তার কাছে অদ্ভুত ঠেকে! রাস্তায় জল-দেওয়া হইতে গ্যাসের আলোক পর্য্যন্ত সে কৌতূহল-চক্ষে দেখে। ক্লাসের ছেলেদের যখন সে কোনো বিষয় হয়ত জিজ্ঞাসা করিত, তাহারা এই গ্রাম্য বালকের অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিয়া উঠিত। সে বেচারা অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া থাকিত!

যখন প্রথম এই সরল গ্রাম্য বালকটী হেয়ারস্কুলে ভর্ত্তি হইল তখন ক্লাসের দুষ্ট ছেলেদের খুব সুবিধা হইল—তারা কল্যাণকুমারকে যেন পাইয়া বসিল। এবং এই বন্ধুহীন বালককে ক্ষেপাইয়া মজা করিবার যে একটা নূতন সুযোগ পাইয়াছে এইটাই তাহারা যথেষ্ট মনে করিত। কিন্তু তাহাদের হার হইল, এই নিরীহ, শান্ত শিষ্ট বালক কোনমতেই ক্ষেপিত না, এবং এমন কি তার মধুর স্বভাব এবং মিষ্ট ব্যবহারে ক্রমে সকলেই বশীভূত হইল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলে, সুবোধকুমার কল্যাণকে মেসের বাহিরে যাইতে দিতেন না—কোনো কোনো দিন তিনি নিজে সঙ্গে করিয়া তাকে একটু গোলদীঘির হাওয়া খাওয়াইয়া আনিতেন। মাঝে মাঝে বায়স্কোপ এবং শীতকালে সার্কাস প্রভৃতি দেখাইতেন —কখনও কখনও বা ইডেনগার্ডেনের ব্যাণ্ড শুনাইয়া আনিতেন আবার ফুটবল খেলার সময়ে ম্যাচও দেখাইতেন।

সুবোধের নিজের একটু গানবাজনার সখ ছিল। কল্যাণও বেশ মিষ্ট গায়। তাই সুবোধ যত্ন করিয়া নিজে তাকে অবসরমত গানবাজনা শিখাইতে লাগিলেন।

অবস্থার ফেরে পড়িয়া বি, এ, পাশ করার পর, সুবোধকুমার বরিশাল জেলার কোনও গ্রাম্য স্কুলে হেডমাষ্টারী লইলেন। প্রাইভেটে এম, এ, দিবেন বন্দোবস্ত করিলেন। দুই বৎসর একত্র থাকার পর সুবোধ ও কল্যাণের ছাড়াছাড়ি হইল। কমলার কাণে যখন এ খবর পৌঁছিল, অভিভাবকহীন পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি মনে মনে একটু ভয় পাইলেন। সুবোধ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে মেসের একজন ভালছেলের উপর কল্যাণের

তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া সে যাইতেছে। ভয়ের কোনও কারণ নাই—মাতৃহৃদয় সে আশ্বাস বাক্যে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইল না কিন্তু যখন উপায় নাই তখন আর কি হইবে ? ভগবান ভরসা।

কলিকাতার অলিতে-গলিতে ড্রামাটিক ক্লাব নামে ছেলে-বিগড়ানের কারখানা আছে, তার খর্পরে পড়িয়া কত বুদ্ধিমান ভাল ছেলেদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে—অধঃপতনের সদর রাস্তার মাল মশলা এই কারখানায় তৈয়ারী হয়। কল্যাণের ক্লাসের দুই একজন ছেলে স্কুল পালাইয়া কোন্ একটা ড্রামাটিক ক্লাবে মিশে। কল্যাণ গাহিতে পারে, তারা একদিন ধরিল যে চল না ভাই একটু গান বাজনা শুনাইবে। কল্যাণ অত শত জানে না, তবু প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিল কিন্তু বন্ধুদের অনুরোধের তোড়ের মুখে তার আপত্তি বেশীক্ষণ টিকে নাই। স্কুলের ছুটির পর মেস হইতে জল খাইয়া সে বন্ধুদের সঙ্গে গেল—এখন ত আর সুবোধ-কুমার নাই, সুতরাং তাহাকে আর কে বাধা দেয় ? ড্রামাটিক ক্লাবে সে গেল—দুই একটা গানও গাহিল কিন্তু তাহার সেখানে ভাল লাগিল না। সেখানকার আলাপ, কথাবার্ত্তা, চালচলন, তার কাছে খাপছাড়া ঠেকিল। কাজেই যখন সে সেখান হইতে বাহির হইল তখন যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এতক্ষণ যেন সে বন্দী ছিল, বাহিরে আসিয়া মুক্তির আনন্দে তার ক্ষুদ্র প্রাণ নাচিয়া উঠিল।

কিছুদিন যায় আবার বন্ধুরা ধরিল "চল না ভাই আজ একবার যাওয়া যাক।" তাহারা যে তাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে একথাটা হাজার হোক সেত এখনও তেমন চালাক হয় নাই, তাই বুঝিতে পারে নাই। একটা ভাল ছেলের মাথা খাইতে

হইলে কতদূর সাবধানতা এবং কৌশল দরকার, তাহা ড্রামাটিক ক্লাব যাহারা চালায় তাহারা জানে। তাদের শিক্ষা এবং নির্দ্দেশ অনুসারে কল্যাণের বন্ধুরা কল্যাণকে কি ভাবে পাকড়াইতে হইবে, সে উপায় বুঝিয়া লইল। অনিচ্ছাসত্ত্বে কল্যাণ মাঝে মাঝে যায়, এবং যখনই যায় তখনি কে তার মনের ভিতরে বলে "তুমি ও-সবে যেও না।" দুঃখিনী মায়ের মুখখানি মনে পড়ে, কল্যাণীর কচি সুন্দর মুখখানি মনে পড়ে—আর সে প্রতিজ্ঞা করে, না আর যাব না। কিন্তু বন্ধুদের ডাক যখনই পড়ে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাদের অনুসরণ করে। কল্যাণ এখন নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়। সে মনকে উল্টারকম বুঝাইল "আচ্ছা যাওয়ায় দোষ কি—আমি যদি ভাল থাকি তাহলে মন্দ করে কে ?" পতনের মুখে অনেকেই এই ভুল করে, এই হইল সর্ব্বনাশের সূত্রপাত। প্রলোভন হইতে দূরে থাকিলে ভাল থাকাটা সহজ, কিন্তু প্রলোভনের মধ্যে পড়িলে ভাল থাকা বড় শক্ত কথা! যেটা সহজ, লোকে সেইটাই করে, যেটা শক্ত সেটা কয়জনে পারে? ভাল হওয়াটা যে খুব সহজ তাহা ত নয়, অনেক কষ্টে তবে একটা ভাল লোক পাওয়া যায়।

কল্যাণকুমার নিজের দোষে ফাঁদে পড়িল—তার মন ঠিক বুঝিয়াছিল, কিন্তু সে যেদিন তার কথা অগ্রাহ্য করিল সেই দিন হইতেই পতনের সুরু হইল। পূর্ব্বে সে কখনও কখনও যাইত, এখন সে নিয়মিত সন্ধ্যায় যায়। সেখানে যারা আসে-যায় ও তার মধ্যে আগে যে একটা পার্থক্য ছিল, সেটা যাতায়াত ও মেলামেশার মধ্যে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিত আমি ত লেখাপড়ায় অবহেলা করছি না—লেখাপড়া

করে একটু গান বাজনা করি, এতে আর দোষ কি? যখনই সে এই রকম ভাবে, তখনই কে জানে কেন তার মায়ের কাতর দৃষ্টি চোখের উপর আসিয়া পড়ে?

পুত্রের যে কতদূর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কমলা সে বিষয়ে কিছুই জানিলেন না। ঘটনাচক্রে তাঁর মনে খট্‌কা বাধিল, তিনি ত ভয়ে সারা হইলেন। উঃ, কল্যাণ যদি মানুষ না হয়, তাহলে তাঁর বুকে যে যন্ত্রণা বিঁধিবে সে যে মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও ভীষণ। কল্যাণ প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়াছে সত্য বটে, কিন্তু পরীক্ষার ত প্রায় এখনও এক বৎসর বাকি, তবে সে পূর্ব্বের ন্যায় আর চিঠি দেয় না কেন, আর যখনই চিঠি আসে, সে যে খুব ছোট্ট - সব সময়েই সে ব্যস্ত? সহসা এত ব্যস্ততার বোঝা তার ক্ষুদ্র ঘাড়ের উপর কি করিয়া চাপিল?

ফাল্গুনমাসের শেষে, সেইবার কল্যাণদের গ্রামে খুব জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইল। ঘরে ঘরে লোক জ্বরে পড়িল কে কাহাকে দেখে ঠিক নাই। মাতার নিকট হইতে ঠিক এই সময়ে পত্র আসিল, কল্যাণীর জ্বর হইয়াছে—জ্বর বেশী নয়। সে যে চিঠি পাইয়াছে একথা ভুলিয়া গেল তিনদিন পরে পুনরায় চিঠি পাইল যে কল্যাণীর জ্বর বাড়িয়াছে, মাতা তাহাকে যাইবার জন্য লিখিয়াছেন। এই চিঠিখানার উত্তর দিবে-দিবে করিয়া দুই দিন কাটিয়া গেল আবার চিঠি আসিল যে পত্র পাঠ সে যেন চলিয়া আসে, কল্যাণীর অসুখ শক্ত। এইবারে তার মনে লাগিল—বহুদিন পরে ছোট বোনের মুখখানি মনে পড়িল, তার যাইবার ইচ্ছা হইল। সঙ্গীরা পরামর্শ দিল—"আরে তুমিত ডাক্তার নও, ও তোমার মা ভয় পেয়ে লিখেছেন, ও

তোমাদের দেশের ম্যালেরিয়া” তাহাদের পরামর্শে তার মন ভিজিল--সে দেশে গেল না।

পরের দিন দুপুর বেলায় টেলিগ্রাম আসিল—“যদি কল্যাণীকে দেখিতে চাও পত্র পাঠ আসিবে। জীবন সঙ্কটাপন্ন।” সৌভাগ্যের বিষয় যে এই টেলিগ্রামখানা সুবোধ যে যুবককে তত্ত্বাবধান করিতে বলিয়াছিল তার হাতে প্রথমে পড়ে। সে কল্যাণকে একচোট খুব ভর্ৎসনা করিল। কল্যাণেরও মনে মনে ভয় হইল —তবে সত্য সত্যই কি কল্যাণী বাচিবে না, সে না বাঁচিলে মা ও বাঁচিবেন না। উঃ—সে কি নির্দ্দয়! বহুদিন পরে সে যেন নিজেকে ফিরিয়া পাইল -নিজের বর্ত্তমান অবস্থায় নিজের উপর ঘৃণা জন্মিল। কল্যাণী ও সে ছেলেবেলায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে মায়ের কাছে রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শুনিতে যে বড় ভালবাসিত— কল্যাণী ছোট হইলেও চট্ করিয়া বুঝিতে পারিত, ছোটবোনের বুদ্ধির নিকট সে ত বরাবরই হার মানিয়াছে। কল্যাণী ও সে ছাড়া মায়ের যে আর কেউ নাই! কল্যাণী তাকে কত ভালবাসে! আজ কিনা সে তার সেই সরল ভালবাসাকে তুচ্ছ করিয়া, যারা তাহাকে অধঃপতনের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে তাদের পিছনে ছুটিয়াছে! যদি বাড়ী গিয়া—না, সে আর ভাবিতে পারে না। তার অনুতপ্ত হৃদয়ের প্রার্থনা সে ভগবানকে জানাইল -“হে ঠাকুর একবার ক্ষমা কর, দয়া করে কল্যাণীকে রক্ষা কর।” রোগশয্যায় পড়িয়া কল্যাণী ভাবে “কই দাদাত এলনা—তবে দাদা আর আমায় একটুও ভালবাসে না,” অভিমানে তার ক্ষুদ্র বুকটি ভাঙ্গিয়া যায়। এমন সময় একদিন ঠিক সন্ধ্যাকালে বাস্তবিকই যখন দাদা আসিল, তার রোগতপ্ত শুষ্ক ফুলের

গ্যায় সুন্দর মুখখানিতে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। কল্যাণকুমার কল্যাণীকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল—আট দশ দিনের জ্বরে এত পরিবর্ত্তন! আড়ালে গিয়া সে স্নেহময়ী জননীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া খুব কাঁদিল এবং পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিল। মাতা তাহাকে চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কবিরাজের হাতযশে ও সেবার গুণে কল্যাণীর অবস্থা দুইদিন পরে ভালর দিকে ফিরিল। ক্রমে তার জ্বর ছাড়িল, সে পথ্য পাইল।

গ্রীষ্মাবকাশ আসিয়া পড়িল কল্যাণকুমার তাই আর কলিকাতায় গেল না। সুবোধকুমারও ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছেন। এই সময়ে কল্যাণ একদিন মাতাকে বলিল—"মা, আর কল্‌কাতায় যাব না, কাকার সঙ্গে যাব, কাকার স্কুলে পড়ব।" মাতা পুত্রের কথাটা বুঝিলেন, এবং সুবোধকে বলিয়া এ বিষয়ে ঠিক করিলেন। ছুটীর পর সুবোধের সঙ্গে সে গেল এবং গিয়া বরিশালের গ্রাম্য স্কুলে নাম লিখাইল।

সুবোধ কমলাকে লিখিল যে কল্যাণ বেশ লেখাপড়া করিতেছে। ক্রমে পরীক্ষা নিকটে আসিল তখন কল্যাণ একাগ্রমনে লেখাপড়ায় ব্যস্ত।

পরীক্ষার পরে সে দেশে ফিরিয়া আসিল—গেজেটে বাহির হইবার পূর্ব্বেই সুবোধকুমার কমলাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, কল্যাণকুমার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে—খবর শুনিয়া কল্যাণী পাড়া মাথায় তুলিল, তার আনন্দ আর ধরে না—"কাকা লিখেছেন আমার দাদা খুব ভাল পাশ করেছেন।" ইহার কিছুদিন পরে গেজেটে পাশের খবর বাহির হইল। কল্যাণকুমার "জলপানি" পাইয়াছে ক্রমে সে খবরও বাহির হইল।

দুঃখিনী মাতা আজ আপনাকে সার্থক মনে করিলেন। পুত্রের সফলতার আনন্দে তাঁর মাতৃহৃদয় পূর্ণ হইল, আজ এই সুখের দিনে অতীতের একটা কথা তাঁর মনের কোনখানটায় আঘাত করিল, তাই আনন্দে আকুল হইলেও তাঁর চোখের জল বাধা মানিল না। বেদনা এবং আনন্দেব অশ্রুজলে তিনি পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন "বাবা, ভগবান, তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

কল্যাণীর উচ্ছ্বসিত আনন্দ আজ ফোয়ারার ন্যায় চারিদিকে ছুটিতে লাগিল!

গ্রামের কথা

আমি গ্রাম আমার কথা তোমরা শুনিবে কি? আমার কাহিনী হয়ত তোমাদের শ্রুতিমধুর হইবে না, কেন না, অতি সামান্য একটা ছোট গ্রামের সুখ-দুঃখের কথা ভাল না লাগিবারই ত কথা। তবু দয়া করিয়া একটু ধৈর্য্য ধরিয়া আমার গোটাকয়েক প্রাণের কথা শোনই না কেন? আমার চিররুদ্ধ মর্ম্মবেদনাকে ব্যক্ত করিয়া আমার নিজের মনের বোঝাকে একটু হাল্কা করিতে চাই। অনেক কাজ করিতে ভাল লাগে না, তবু করিতে হয়; অনেক জিনিস লইতে ভাল লাগে না, তবু গ্রহণ করিতে হয়; অনেকের সহিত মিশিতে ভাল লাগে না, তবু মিশিতে হয়—ভাল-লাগার জিনিস যে সংসারে বড় দুর্ল্লভ! দৈনিক জীবনের কর্ম্মধারার মধ্যে দিবসের শেষে একবার হিসাব করিয়া দেখিও—প্রতিদিনই দেখিতে পাইবে যাহা ভাল লাগে নাই তাহা বিপুল, এবং যাহা ভাল লাগিয়াছে তাহা তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। সুতরাং আমার কাহিনী তোমাদের ভাল না লাগিলেও শুনিতে হইবে। কেমন শুনিবে না কি?

গতি জগতের নিয়ম। জগতের এক কোণে খানিকটা জায়গা জুড়িয়া আমি আছি। আমিত জগৎ ছাড়া নই, সুতরাং আমি নিয়ম ছাড়াও নই।

কালের ধর্ম্ম ভাঙ্গা-গড়া, যাহা গড়িয়া তোলা যায়, তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে—যাহা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাই আবার নূতন আকারে

গড়িয়া উঠে। প্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্যে ভাঙ্গা-গড়ার এই অদ্ভুত চঞ্চল খেলা সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

মানুষের পক্ষে যে সত্য খাটে আমার পক্ষেও তাহা খাটে। জগতে অবস্থা বিপর্যায় ঘটে—আমার ঘটিবে না কেন? একভাবে কোন জিনিসই থাকিতে পারে না—উন্নতি অথবা অবনতির আবর্ত্তনে সকলকেই ত পড়িতে হয়।

কালচক্র ঘুরিতেছে কাহারও দিকে দৃক্‌পাত করে না, অবিশ্রাম তার গতি—ওঠা পড়া কালের গতিকে।

চিরদিন সমান যায় না, তাই আজ আমার ভাঙ্গা দশা! আমার এ অবস্থা ছিল না, এক দিনে ত আমার এ অবস্থা হয় নাই—পলে পলে তিলে তিলে আমি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছি। আজ আমার এতখানি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে যে, আমি কি ছিলাম এবং কি হইয়াছি, সেই ভাবনা ভাবিতে গেলে একটা নিবিড় গভীর বেদনায় মর্ম্মস্থান টন্‌টন্ করিয়া উঠে!

বুক বহুদিন ফাটিয়াছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কখনও আমি দুঃখের কাহিনী প্রকাশ করি নাই, কারণ আমার দুঃখের কাহিনী আমার সন্তানদের পক্ষে অগৌরবের হইবে! সেইজন্য ত আমি সব নীরবে সহ্য করিয়াছি, কিন্তু আর চাপিতে পারিলাম না!

আমার পশ্চিম ধার দিয়া গঙ্গা আজও বহিয়া যাইতেছেন। কুলুকুলুনাদিনী ভাগীরথী সেইরূপ নাচিতে নাচিতে সাগরাভিমুখে ধাবিতা। গ্রামের ঘাটে বড় বড় বোঝাই নৌকা আর লাগে না দেশ বিদেশ হইতে কত রকমের জিনিসই না পূর্ব্বে আসিত, কিন্তু এখন আর কি করিতেই বা আসিবে? জিনিসের খরিদ্দার কোথায়?

সে বড় বেশী দিনের কথা নয়, এই ক্ষুদ্র গ্রামে বারো মাসে

তের পার্ব্বণ লাগিয়া থাকিত। দোল দুর্গোৎসবে কত ঘটা হইত! বৎসরে দুইবার করিয়া মেলা বসিত! দেশ বিদেশ হইতে মেলা দেখিবার জন্য কত লোকই না আসিত! আমার তখন সুখের দিন কিনা, তাই জমিদার হইতে সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত আমাকে খুব ভালবাসিত। আমি সে-ই আছি, কিন্তু মানুষের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! আমার মাটি, আমার জল, আমার অন্ন, আমার ফল, যাহাদের পুষ্টিসাধন করিয়াছে ও তৃপ্তি দান করিয়াছে তাহারা আমাকে শ্রদ্ধা করিত! কিন্তু আজ! থাক্ সে কথায় আর কাজ কি!

এখন আর কেউ গ্রামে থাকিতে চায় না। তাই না, আজ আমার দুরবস্থা। জমীদার হইতে সামান্য অবস্থার ভদ্রলোকের প্রাণের সাধ যে তাঁরা সহুরে হয়েন। এ সাধ কেন?—তৃষ্ণার সময় যাদের মুখে জল দিয়াছি, ক্ষুধার সময় যাদের মুখে অন্ন দিয়াছি, রৌদ্রে আমারই গাছ যাদের ছায়াদান করিয়াছে, তারা আমাকে চায় না কেন? সত্য বটে আমার অঙ্গে বিলাসের কোনও চিহ্ন নাই, কিন্তু আমার বক্ষে শান্তি আছে! দিবসে আমার আঁকা-বাঁকা পথে নিত্য কর্ম্ম-কোলাহল তেমন ধ্বনিত হয় না, কিম্বা রজনীতে গ্যাসের উজ্জ্বল আলোকে আমার পথ ঘাট উদ্ভাসিত হয় না—কিন্তু আমার নিজস্ব যাহা আছে সহরের বিলাস আড়ম্বরের বহুলতার মধ্যে তাহা পাওয়া যায় কি?

পূর্ণিমা রাত্রে আমার বিচিত্র শ্যাম সৌন্দর্য্যের উপর চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হইয়া যে নয়ন-মন-বিমুগ্ধকর নিবিড় শোভারাশিকে উচ্ছৃত করিয়া তুলে, সে যে বিশ্বদেবতার স্বহস্তের দান! প্রভাতের আলোকস্পর্শে বিহগের কাকলি যখন গগনমেদিনী পূর্ণ করে, যখন

রজনীর সুপ্তিভঙ্গে মানব প্রথম নয়ন মেলিয়া দেখে, যখন শ্যাম-শস্পাবৃত আমার শ্যামল অঞ্চল আলোকে জ্বলিয়া উঠে এবং বাতাসে দুলিতে থাকে, আমার সেই ভুবনমোহিনী রূপ, আমার সেই বিজয়িনী শ্রী, যে দেখে তাহারই ত হৃদয় স্পর্শ করে!

গ্রামে এখন আর জমীদার বাস করেন না, তিনি কলিকাতায় থাকেন। শুনিতে পাই কলিকাতায় না থাকিলে তাঁর নাকি কাজের সুবিধা হয় না। হঠাৎ এই সত্যটা কেন যে তাঁহাকে প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে আমি তাহা ভাল বুঝিতে পারি না—সেখানে বড় বড় সাহেব এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে মিশিয়া তাঁর নাকি দিন দিন প্রতিপত্তি বাড়িতেছে। বড় বড় সভায় বড় বড় আসরে তাঁর নিত্য নিমন্ত্রণ হয়—সহর কলিকাতা খরচের বোঝাটাও নাকি তাঁর স্কন্ধে বেশ করিয়া চাপাইয়াছে। যশ ও মান তিনি বেশ কিনিতেছেন! আজ আর আমার দিকে তাঁর দৃষ্টি নাই—সহরের প্রচণ্ড উত্তেজনায় এখন যে তিনি আত্মহারা! প্রকাণ্ড জমীদারভবন বাস্তবিকই আজ শ্রীহীন! জনকয়েক আমলা ও নায়েব বসিয়া এখন দপ্তর চালাইতেছে—তা' যে চালাইতেই হইবে, নহিলে বাবু কলিকাতায় কাবু হইবেন!

যাঁরা লেখা পড়া শিখিয়া মানুষ হইয়া প্রবাসে কাজ কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁদের কথা ছাড়িয়া দাও, তাঁদের মধ্যে কেহ নানাস্থানী হইয়া ঘুরিতেছেন, কেহ বা প্রবাসে নূতন বাস স্থাপন করিয়াছেন—হায়, আমার কথা কেহ মনে করে না!

মনে করে ওগো মনে করে! যাদের তোমরা চির দিন ধরিয়া তুচ্ছ করিয়া আসিতেছ, তারাই আমাকে মনে করিয়া রাখে—যাহারা দরিদ্র, যাহারা হীন, যাহারা অশিক্ষিত, যাহারা

এখনও ভদ্রলোক হইতে শিখে নাই, যাহারা মৌন মূক, যাহারা সংবাদপত্রে হৈ চৈ করে না, যাহারা সভাসমিতি করে না, তাহারাই আমাকে ভালবাসে!—তাহারা জানে আমার ফলে অমৃত, শস্যে তৃপ্তি! তাই তাহাদের "নিঙ্গান" ছোট ছোট কুটীর-গুলি পরিচ্ছন্ন, কুটীরের সাম্‌নে ফল মূলের বাগানগুলি কেমন যত্নে রক্ষিত! তারা সেবা দ্বারা আমাকে তুষ্ট রাখে, কিন্তু তারা দরিদ্র! তারা ত আমার সকল অভাব মোচন করিতে পারে না!

যাহারা আমার অভাব মোচন করিতে সক্ষম, তাহারা আমার কথা ভাবে না। আমার অঙ্কে তারা যে পালিত একথা ভাবিলে আজ তারা অনেকেই মরমে মরিয়া যায়! যদি কেহ তাহাদের পাড়াগেঁয়ে বলে, তবে তারা চটিয়া যায়, যেমন বাঙ্গালী সাহেব সাজিয়া ফিরিলে, কেহ যদি তাহাকে বাবু বলে সে চটিয়া যায়! ছদ্মসাজে তার বাঙ্গালীত্ব যে কোন দিন ঘুচে না ক্ষণিকের মোহে এ কথাটা সে যে ভুলিতে চায় তাই সাজা সাহেব যে সাহেব নহে, এ কথা সে একবার ও ভাবিয়া দেখে না! তার সাজা বেশে সে যাহা নয় তাহাই ব্যক্ত করিবার ব্যর্থ প্রয়াসের মধ্যে যে প্রচণ্ড আত্ম-প্রবঞ্চনা গভীরভাবে নিহিত আছে, এক বাবু সম্বোধনেই তাহা চকিতের মতন দৃপ্ত হইয়া তাহাকে পীড়ন করে এবং যাহা ভুলিবার নয়—তাহাকে ভুলিবার চেষ্টার মধ্যে দুর্ব্বলতা ধরা পড়িয়া যায়! কলের পুতুল যেমন মানুষ হয় না, তেম্নি সাজা সাহেবও কোনদিন সাচ্চা সাহেব হয় না! এক পুরুষে পল্লীগ্রামের বাস উঠাইয়া যাহারা সহরের হইতে চায়, তাহারা সহুরে হয় না!

তোমরা বলিবে অসুখ বিসুখের দৌরাত্ম্যে পল্লীজীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে—পল্লীগ্রামে বাস করা এখন অসম্ভব।

উত্তম, তোমাদের কথায় আমি প্রতিবাদ করিতে চাহি না; কিন্তু বাস্তবিক কথাটার কি মূল্য আছে?

ম্যালেরিয়া সর্ব্বত্র আছে মানি, কিন্তু তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছ কি? পাঁচ জনে মিলিয়া চেষ্টা করিলে দেখিবে আমি বাসের অযোগ্য নই। আসল কথা বল না কেন, তোমরা আর এখানে থাকিতে চাও না।

আমাকে ছাড়িয়া তোমরা অনেকেই সুদূরে চলিয়া গিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সুখে থাক। আর আমি? আমি ছিলাম, আমি এখনও আছি এবং বরাবরই থাকিব। জগতে যে আমার থাকিবার একটা সর্ত্ত আছে! সত্য বটে, সহরের সাজ-গোজ আমার অঙ্গে নাই, কিন্তু প্রকৃতি যে আমাকে নিজের হাতে সাজাইয়াছেন। বাঙ্গালার শ্যাম শোভা মুছিয়া গেলে বাঙ্গালার যে আর কিছু থাকে না! আমার সবুজ মাঠ, হরিৎ ক্ষেত্র, ঘনছায়াময় নিবিড় বৃক্ষশ্রেণী এ সকলে তোমাদের আর মন উঠে না। গড্ডলিকাস্রোতে যারা গা ভাসান দিয়াছে, তারা আমার কি বুঝিবে?

শিবের ঘরণী সতী যেদিন কৈলাস ছাড়িয়া পিতৃগৃহে গিয়াছিলেন, মনে পড়ে, সেদিন মায়ের অঙ্গ সাজাইবার জন্য কুবের তাহার অক্ষয় ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। মনে পড়ে, বহুমূল্য অলঙ্কারে মায়ের বরবপু সজ্জিত করিবার পর, কুবের তাঁর চরণপদ্ম কমল দিয়া সাজাইয়াছিল। কেন জান? চরণকমলে কমল ভিন্ন আর যে কিছু শোভা পায় নাই—তেম্নি জেন বাঙ্গালার শ্যাম সৌন্দর্য্যই বাঙ্গালার শোভা, তার অন্য কোন সাজ মানায় না!

এই সেবারে গ্রামে যখন জলকষ্ট হইয়াছিল—গ্রামের নিতাই

মণ্ডল তোমাদের দুয়ারে হাঁটাহাঁটি করিয়া একটি পয়সাও আদায় করিতে পারে নাই। তোমরা সাফ জবাব দিয়াছিলে যে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে যাও। নিরুপায় হইয়া বাস্তবিক সে বেচারা সাহেবের কাছে গিয়াছিল, তিনি তোমাদের মত নির্ম্মম নন, তিনি যাহা হউক আশ্বাস দিয়াছিলেন। তোমরা আমার উপযুক্ত সন্তান কিনা, তাই আমার কষ্টের দিনে তোমরা আমার দিকে চাহিলে না!

গরীবের ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া যখন বড়লোকের মেয়ে বিবাহ করিয়া দরিদ্র পিতামাতার পর হইয়া যায়, তখন তাঁদের বক্ষে কি বেদনা বাজে না? কিন্তু সেই গভীর বেদনা যে নীরবে সহিবার—কহিবার নয়! ওগো, তেম্নি আমার সন্তানেরা যখন একে একে আমার পর হইয়া যাইতেছে, তখন আমারও যে অসহ্য বেদনায় বুক কেমন করিয়া উঠিতেছে!

আমি কাঁদি। নিজের জন্য কাঁদি, তোমাদের জন্যও কাঁদি। অভিনয় ছাড়, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শেখ। সাচ্চা ও ঝুটার প্রভেদ আছে জান—কিন্তু তোমাদের ব্যবহারে এ দুইটার পার্থক্য কোথায়, তা' আমি ঠাহর করতে পারি না! দেশ—দেশ—করিয়া, কবিতায়, গানে বক্তৃতায় কাণ ঝালাপালা করিয়া তুলিয়াছ! আমাকে বাদ দিলে দেশের দেশত্ব কোথায় থাকে? জননীরূপে, ধাত্রীরূপে যে চিরদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছে, সেইত দেশ! যতদিন আমি উপেক্ষিতা, লাঞ্ছিতা, ততদিন সকলে বুঝিবে বাঙ্গালী মায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানে না! আমাকে যাহারা জানে, আমাকে যাহারা চিনে, তাহারা সেবার দ্বারা অন্ধভক্তির দ্বারা, ভালবাসার দ্বারা আমাকে সার্থক করিয়া তুলিতে চাহে। তোমরা যদি সত্যই দেশ-মাতৃকার স্বরূপ জানিতে,

তা'হলে বাঙ্গালার পল্লীভবনের এতদূর দুর্দ্দশা ঘটিত না। তোমাদের বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে, তোমরা সকলেই জান আমার মাটী সোণা, জল ক্ষীর, শস্য সুধা অথচ পল্লীজীবন এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে পল্লীসমাজ সম্বন্ধে তোমার এই ঔদাসীন্য বাঙ্গালীর জীবনকে খাপছাড়া এবং বাঙ্গালীর সমাজকে দেশছাড়া করিয়া তুলিতেছে এখনও যদি দেখ ভাল হয়—নচেৎ বিলম্বহেতু বিড়ম্বনার বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে। সময় থাকিতে সাবধান হও—এই আমার শেষ কথা!

গ্রন্থকার-রচিত পুস্তক

বিধান-গীতিমালা	...	...	॥০
ছ-খানা ছবি, (গল্পের বহি) বাঁধাই		..	৸০
ঘটনার স্রোত (উপন্যাস) যন্ত্রস্থ			
প্রীতি-গীতি (কবিতার বহি) ঐ			